সেরা গল্প সিরিজ (১)

জার্ম্মাণীর সেরা গল্প

অনুবাদক

শৈলবিহারী ঘোষ

বুক ষ্ট্যাণ্ড

১১এ, [illegible] লেন

৯১।১।১এ বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা

শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় তর্জমা-সাহিত্যের দ্রুত পরিণতি খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। অত্যল্পকাল পূর্বেও বিদেশী রচনার অনুবাদ ক্বচিৎ দেখা দিত এবং তার একমাত্র দাম ছিল য়ুরোপীয় লেখকের নামের প্রসঙ্গিত। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যহিসাবে তর্জমাকে গ্রহণ করা হত না, অনুবাদক পেতেন পরিচয়পত্র বাহকের আসন। এখন সবই বদ্‌লেছে ; ভালো তর্জমা যে সৃষ্টিশীল লেখকেরই সাধ্য, কেবলমাত্র ভাষাবিদ্ হলেই চলে না। একথা পাঠক এবং প্রকাশকেরা স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন। যুদ্ধের বাজারে কী উপায়ে বহুলসংখ্যক অনুবাদগ্রন্থ ছাপবার কাগজ পাওয়া যাচ্ছে এবং যথেষ্ট দাম দিয়ে যে-সকল পাঠক পাঠিকা বই কেনেন তাঁরা ইংরেজি ভাষা জানেন কিনা, অথবা ইংরেজি জেনেও বাংলা অনুবাদই তাঁরা কেন পছন্দ করেন এই সব প্রশ্নের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। যথেষ্ট অনুবাদ বেরোচ্ছে এবং তার প্রচলনও যথেষ্ট এইটেই বড়ো কথা। গোলদিঘির চারপাশে ছোটো বড়ো বইয়ের দোকানগুলিতে বাংলা অক্ষরে লেখা বিবিধ বিদেশী নাম দেখতে পাওয়া যায়। বেশি দিন একই অনুবাদ-গ্রন্থ, বিশেষ ক'রে উপন্যাস এবং ছোটো গল্প কাঁচের আড়ালে শোভমান হয় না ; পুস্তকবিলাসী পদাতিকেরা সেটা লক্ষ্য ক'রে থাকেন। তারপর হঠাৎ একদিন মাসিকপত্রে দেখা যায় দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শুনতে পাই রাশিয়ান্ সাহিত্যের অনুবাদই বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশি ছাপা হয়। তার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি এই যে যুদ্ধকালেও ঐ দেশে যত আশ্চর্য গল্প লেখা হয়েছে—অন্ততপক্ষে যুদ্ধের প্রথমদিকে—

তার তুলনা নেই। যুরোপের বাকি ভূখণ্ড আমাদের কাছে নীরব হয়ে রইল, একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া। কিন্তু ফ্রান্সে জর্মানিতে, হাঙ্গেরি বা গ্রীস দেশে কি দুচারটিও শ্রেষ্ঠ লেখা বেরোয়নি। লেখকের দল তো সকলেই শাসক সম্প্রদায়ের পোষ্যপুত্র নন, তাঁরা রক্তচক্ষুকে এড়িয়েই শান্ত দৃষ্টিতে দেখা জগৎকে ব্যক্ত ক'রে থাকেন,—তাঁদের পরিচয় কই। যুদ্ধাবসানে কি তাঁদের লেখা পড়তে পাবো না? যাঁদের কলম সন্ত্রাসে থামেনি, যাঁরা অগোচরে তাঁদের শিল্প-বিচারের সাক্ষ্য রেখে গেছেন তাঁদের রচনাও বাংলা ভাষায় উত্তীর্ণ হোক্।

শৈলবাবু জর্মান গল্পের এই তর্জমাগুলি ছাপিয়ে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যকে চিনতে হলে য়ুরোপের প্রত্যেক ভাষার দ্বারস্থ হতে হবে, কোনো দেশকে বাদ দিলে চলবে না। এই বইয়ের গল্পগুলি অবশ্য প্রাক্-যুদ্ধকালীন জর্মানিতে লেখা, কিন্তু এর মধ্যে সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি স্বাদ পাওয়া গেল যা ঐ দেশেরই উৎকর্ষজাত। পরবর্তী জর্মান সাহিত্যে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রযন্ত্রে নিপীড়িত স্বাভাবিক মানুষের কাহিনী শোনা যাবে। পোলণ্ড, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হতেও নূতনতর সাহিত্যের সংবাদ পাওয়া যাবে. তারও তর্জমা বাংলায় বেরোবে আশা করে রইলাম।

"জার্ম্মানীর সেরা গল্প" বইখানি যথার্থ ই উৎকৃষ্ট গল্পের সংগ্রহ; বাংলা সাহিত্যে তার বিশেষ স্থান হবে। অনুবাদকের রচনাভঙ্গী সহজ এবং সাবলীল, পড়লে ভুলে যেতে হয় তর্জমা পড়ছি। চয়নের শিল্পরুচি এই অনুবাদগ্রন্থকে যথাথ ই সমৃদ্ধ করেছে; শৈলবাবুকে আমার অভিবাদন জানাই। পাঠককে অনুরোধ করি ভূমিকা ত্যাগ করে এখন সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করুন।

অমিয় চক্রবর্তী

সূচীপত্র

বড়দিনের স্বীকারোক্তি

ভদ্রলোকটী মহিলাটীকে সম্বোধন করে বললেন,—"বেশ ভালই হয়েছে, এবারে একসঙ্গে মেলা গেছে, সময়টা মধুর আলাপ-আলোচনায় বেশ কাটান যাবে। ছুটীটা ফুরিয়ে গিয়ে মন্দ হোল না ; অসংখ্য লোকের কলরব থেকে নিষ্কৃতি আপনিও পেলেন, আমিও পেলাম। কি বলুন, একটু অবসর পেয়ে বাঁচা গেল ?"

ভদ্রলোক আবার বলে চললেন—"বড়দিনের ছুটীর এই বিরাট অবসরের সময়টা আমাদের মত চিরকুমারদের কাছে কি রকম যন্ত্রণাদায়ক বলুন তো ? নির্জ্জনতার মধ্যে পড়ে মনটা যেন হাঁফিয়ে ওঠে। আনন্দকে সকলের মধ্যে হারিয়ে দেবার ক্ষমতা আমাদের আছে বটে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপরের আনন্দের অংশীদার আমরা হতে পারি না। তার প্রথম কারণ, মনের ভেতর নিজের সম্বন্ধে ভালমন্দ অনেক কিছু সমালোচনার ঢেউ উঠতে থাকে ; দ্বিতীয় কারণ, নিঃসঙ্গ মরু জীবনের অনন্ত শূন্যতা।"

ভদ্রলোক আরও বললেন—"আপনার মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমার হৃদয়ের গোপন কক্ষের জানালাগুলি আপনার সামনে খুলে ধরি না কেন। তাহলে সমবেদনাও হয়ত আপনার কাছে অনেক পেতে পারি। একটী লোকের উক্তি আমার মনে পড়ে গেল। তিনি কি বলেছিলেন, জানেন ?"

মহিলাটী উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি, বলুন না ?"

ভদ্রলোক বললেন—“প্রকৃত চিরকুমারের মধ্যে সান্ত্বনা পাবার লালসা থাকে না। একবার যখন সে অসুখী হয়েছে, সেই চিরন্তন বেদনার মধ্যেই সে স্বর্গের নীড় রচনা করে থাকে। এ ছাড়া আরেক ধরণের চিরকুমার দেখা যায়। আমি অবশ্য এমন ধরণের চিরকুমারের কথা বলছি না, যাঁরা বন্ধুত্বের ভাণ করে কোন সংসারের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করেন। আমি এমন সব লোক জানি, যাঁরা এক বিশিষ্ট পরিবারের বন্ধুত্ব লাভ করে কোন নারীকে নিষ্কামভাবে ভালবেসেছেন এবং চিত্তমন্দিরে বেদী স্থাপন করে তাকে দেবীর আসনে স্থান দিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটিয়ে গেছেন।”

মহিলাটী মাথা নেড়ে বললেন—“একি সম্ভব।”

এতে ভদ্রলোকটী জবাব দিলেন,—“ভালবাসা নিষ্কাম হতে পারে, এ হয়ত আপনি মানছেন না। তবে হ্যাঁ, খুব শান্ত স্থির উচ্চমনা লোকের মধ্যেও মাঝে মাঝে পশু-প্রবৃত্তি উঁকি ঝুঁকি মারতে পারে, এটা অসম্ভব নয়; কিন্তু তাকে প্রতিরোধও সে করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবারের বড়দিনের ঠিক আগের দিন দুটী ভদ্রলোকের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা বলে আপনাকে পরিষ্কার করে জিনিষটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রতিশ্রুতি দিন যে আমি কেমন করে এই কথাবার্ত্তার মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম তা জানবার জন্য মোটেই অনুরোধ করবেন না, আর যা বলে যাব তা কাকেও ব্যক্ত করবেন না। মেয়েদের মন ত, কোন কথাই তারা চেপে রাখতে পারে না।”

মহিলাটী উত্তর দিলেন—“বিশ্বাস করুন, পৃথিবীর কেউ একথা জানতে পারবে না, আমার কাছ থেকে।”

ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন।

ঘরখানি বেশ বড়, পুরোনো ধরণের আসবাব আর কার্পেটে পরিপাটী

করে সাজান। এর থেকে গৃহস্বামীর বেশ মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সিলিংয়ের মাঝখান থেকে একটী ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ফিকে সবুজ রংএর আলো; আলোটা সাদা চাদর ঢাকা টেবিলের উপর গিয়ে পড়েছে। টেবিলের উপর রয়েছে পানীয় বস্তুর সরঞ্জাম। দুটী ভদ্রলোক সামনাসামনি অর্দ্ধশায়িতভাবে বসে আছেন; বহু বসন্ত তাঁদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। দুজনের দৃষ্টি যেন উদাস। গৃহস্বামীর চোখাল সরু কামানো গোঁফ জোড়া আর কোঁচকান ভুরু দুটি থেকে একটা সৈনিকসুলভ রুক্ষ দৃষ্টি ফুটে বেরুচ্ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি এক সময় সৈনিক ছিলেন। দোলনা চেয়ারের উপর দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে হাতল দুটোকে দুহাতে খুব শক্ত করে ধরে ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে তাঁর নীচের ঠোঁটটি কেঁপে উঠছিল; মনে হচ্ছিল, কিছু হয়ত চর্ব্বণ করছেন। সামনের ভদ্রলোকটী কৌচের উপর বসে ছিলেন। তাঁর দেহটী দীর্ঘ এবং কৃশ, কাঁধ দুটী সরু; মাথা, কপাল ও ভ্রূ থেকে তাঁকে দার্শনিক প্রকৃতির বলেই অনুমান হয়। মুখের লম্বা পাইপ থেকে নির্গত হচ্ছিল সাদা কুণ্ডলি পাকান ধোঁযার সারি। ধোঁয়ায় মুখটাকে যেন আবছা করে দিচ্ছিল। মসৃণ শুকনো বহু রেখা পরিবৃত মুখ থেকে এক রকম শান্ত হাসির আভাস ফুটে বেরুচ্ছিল, এ থেকে অন্তরের একটা নিবিড় আনন্দ আর বৈরাগ্যের পরিচয় মেলে। দুজনেই মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। মাঝে মাঝে জ্বলন্ত আলোর তেল ও তামাকের পাইপের মুখ থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এসে ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। আবছা অন্ধকার ঘরের পিছন থেকে ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে উঠল।

একটু মৃদু ও কাঁপা গলায় দার্শনিক ভদ্রলোক বললেন—"এই সময়েই ত আপনি পান করে থাকেন।"

গৃহস্বামী অভ্যাসমত একটু সামরিক কর্কশস্বরে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক এই সময়েই।"

অতিথি উত্তর দিলেন—"একথা কেন মনে পড়লো জানেন? আপনার স্ত্রী আজ নেই, সত্যিই তাঁর অবর্ত্তমানে একটা অভাব রয়ে গেছে।"

গৃহস্বামী মাথা নাড়লেন।

অতিথি বললেন, "শুধু একবার নয়, চুয়াল্লিশটি বড়দিনে তিনি আমাদের পানীয় পরিবেশন করেছেন।"

গৃহস্বামী -"হ্যাঁ, যতদিন আমি বার্লিনে বাস করেছি ও আপনি যতবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এ অভ্যাসের ব্যতিক্রম আমি তার মধ্যে দেখিনি।"

অতিথি—"গত বছর এই সময়ে আমরা তিনজনে মিলিত হয়েছিলাম, এই মিলনের মধ্যে কি আনন্দই না অনুভূত হয়েছিল! তিনি ঐ আরাম কেদারাটীর উপর উপবিষ্ট হয়ে নিবিষ্টচিত্তে পলের জ্যেষ্ঠ সন্তানের জন্য মোজা বুনছিলেন; খুব দ্রুতগতিতেই বুনছিলেন, কারণ বারোটার মধ্যেই বোনাটা শেষ করতে হবে তাঁর। কথামত ঠিক সেই সময়ে মোজাটা বুনেও ফেলেছিলেন। তারপর আমরা সকলে মিলে সুরা পান করে মৃত্যুর রহস্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এর তিন মাস পরে মৃত্যু এসে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলে গেল। তারপর আমি আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে একটা বিরাট প্রবন্ধ লিখি। আপনি সেটা শুনে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই তিরোধান আমাকেও বড় ব্যথা দিয়েছিল। যাই হোক, কষ্ট হয় বলে সে চিন্তাকে আর মনে স্থান দিই না।"

সৈনিক ভদ্রলোকটী উত্তর দিলেন—"সত্যিই তার তুলনা হয় না; আমাকে কি যত্নই না সে করতো। প্রত্যহ ভোরবেলা আমার আফিসে

যাবার আগে সে নিয়মিত আমাকে এক পেয়ালা করে কফি বানিয়ে দিত, এর মধ্যে যেন তার স্নেহকে সে নিংড়ে দিত। সত্যি কথা বলতে কি, তার দোষও ছিল। আমি জানি, আপনার সঙ্গে সে একবার সস্তা-রকমের দার্শনিক মতবাদ নিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল।"

অতিথি ভদ্রলোকটী এই কথাটীতে একটু চমকিত ও বিচলিত হয়ে বলে উঠলেন,—"আপনি তাঁকে ভুল বুঝেছেন।" বলার সময় তাঁর ঠোঁট দুটী যেন একটু কেঁপে উঠল; সৈনিক বন্ধুটীর চোখের প্রতি তাঁর করুণ ও শান্ত চোখ দুটী নিবদ্ধ হয়ে গেল। দার্শনিক বন্ধুর অন্তর্লোকে অতীতের গোপন পাপের ছায়া ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল।

এই মৌনতাকে ভঙ্গ করে ভদ্রলোক বললেন,—"বন্ধু, শুনুন, আমার মনের ভেতর এমন একটা গুরুভার জমে আছে, যেটা আজ প্রাণ খুলে আপনার কাছে না বলে ফেললে আমার মনে শান্তি আসছে না। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এ বিরাট বেদনাদায়ক বোঝা বহন করে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

সৈনিক বন্ধুটী পাইপের মধ্যে তামাক ঠেসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন—"বলে যান বন্ধু।"

দার্শনিক কম্পিতস্বরে আরম্ভ করলেন:

"এক সময় আপনার স্ত্রী ও আমার মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছিল—"

সৈনিক বন্ধুটী বললেন, "ঠাট্টা করবেন না বন্ধু।"

দার্শনিক—"চল্লিশ বৎসর ধরে এ ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে; এখন আমি এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করে মনটাকে হাল্কা করে দিতে চাই।"

খুব উগ্রস্বরে সৈনিক বন্ধুটী বললেন—"তা হলে আপনি কি বলতে চান, আমার স্ত্রী আমাকে প্রতারণা করেছে?"

দার্শনিক দুঃখজড়িতস্বরে হেসে বললেন—"ছিঃ, আপনি একথা বলছেন!"

সৈনিক বন্ধুটী বিড়বিড় করে কি যেন বলে পাইপটী ধরালেন।

দার্শনিক বন্ধু বলে যেতে লাগলেন, —"তিনি ছিলেন স্বর্গের পরীর মতই পবিত্র। আমরা দুজনেই হলুম পাপী। তাহলে ভাল করেই বলে ফেলি।

তেতাল্লিশ বছর আগেকার কথা। সে সময় আপনি বার্লিনে ক্যাপ্‌টেনের পদে অধিষ্ঠিত। আর আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। আপনার স্মরণ আছে, আপনি তখন কি রকম আসুরিকভাবে জীবন যাপন করতেন।"

সৈনিক ভদ্রলোকটী কম্পিতহস্তে গোফ পাকাতে লাগালেন।

দার্শনিক বলে যেতে লাগলেন,—

"সে সময় একজন পরমা সুন্দরী অভিনেত্রী বাস করতো, যার চোখ দুটি ছিল হরিণের মত টানা টানা, আর দন্ত-পংক্তি ছিল ঝক্‌ঝকে আর ছোট ছোট। আপনার মনে পড়ে বোধ হয়?"

সৈনিক বন্ধু একটু কাঁপা গলায় উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ মনে পড়ে, তার নাম ছিল বিয়ান্‌কা।" বৃদ্ধের শুষ্ক ও কঠিন মুখের উপর দিয়ে একটা কঠোর হাসি খেলে গেল। তিনি আরও বলে যেতে লাগলেন—"জানেন, কি ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষই না সে ছিল, কী ভীষণ কামড়াত ও মারত!"

দার্শনিক বলতে লাগলেন—"আপনি আপনার স্ত্রীকে প্রতারণা করেছিলেন, সে কথা তিনি বুঝে নীরবে এই বেদনা সহ্য করে গেছেন। কোনদিন আপনার কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেন নি। এটা আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি। আমার মার মৃত্যুর পরে তিনিই প্রথম নারী যাঁর সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম। তিনি আমার

জীবনপথে ধ্রুবতারার মতই দেখা দিয়েছিলেন। একদিন সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর অন্তর্বেদনার কারণটা কি। তিনি শুধু মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন যে, তাঁর মনের অবস্থা সে রকম ভাল যাচ্ছে না। এটা পল জন্মাবার কিছুদিন আগেকার কথা। তারপর এল বড়দিনের ঠিক আগের দিন। ঠিক আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগেকার দিনের রাত্রির কথা বলছি। প্রত্যহের অভ্যাসমত রাত্রি আটটার সময় আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছি। তিনি তখন একটা কাপড়ের উপর ছুঁচ দিয়ে ফুল তুলছিলেন, আর আমি তাঁকে বই পড়ে শোনাচ্ছিলাম। আমরা দুজনেই আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যেতে লাগল, কিন্তু আপনি ফিরলেন না। তখন তাঁর মনের অবস্থা যে কী রকম হচ্ছিল তা লক্ষ্য করলুম, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠল, আর তার সঙ্গে আমার শরীরও কণ্টকিত হয়ে উঠল। আমি জানতাম, কি আকর্ষণে আপনাকে সে টেনে রেখেছে। আমার কেমন যেন ভয় হোল; সেই মাদকতাময়ী অভিনেত্রীর বাহুবেষ্টনের মধ্যে থেকে বুঝিবা আপনি বারোটা বাজার কথা ভুলে গেছেন। আস্তে আস্তে ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরিয়ে গেল। তিনি বোনা বন্ধ করলেন, আমার পড়াও বন্ধ হয়ে গেল। একটা ভীতিজনক স্তব্ধতায় ঘরটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল। আমি লক্ষ্য করলাম, এক ফোঁটা চোখের জল তাঁর গাল বেয়ে বোনাটার উপর গিয়ে পড়েছে। আমার সেই সময় মনে হল, লাফিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে আপনাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনি। আমি বেশ অনুভব করলাম, সেই নারীর কবল থেকে আপনাকে ছিনিয়ে আনার ক্ষমতা আমার আছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন—"কোথায় যাচ্ছেন?" ভয়েও যেন মুখটা তাঁর কি রকম হয়ে গিয়েছিল। আমি উত্তর করলাম—

"ফ্রান্‌জ্‌কে ফিরিয়ে আনতে চলেছি।" এ কথা শুনে তিনি চীৎকার করে উঠে বললেন,—"দোহাই আপনার, আপনি এখানে থাকুন; আমাকে একলা ফেলে যাবেন না।" কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর হাত দুটীকে আমার কাঁধের উপর রেখে, অশ্রুসিক্ত মুখখানি আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠল। কোন নারীর এত নিকট সান্নিধ্য আমি এর আগে অনুভব করিনি। মনকে সংযত করে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করলাম। মুখচোখ থেকে বুঝলাম, সত্যিই তিনি সান্ত্বনার প্রয়াসী। আপনি ফিরে আসবার পর, আমার মুখের কি অবস্থা হয়েছিল, আপনি তা লক্ষ্য করেন নি। আপনার মুখ থেকে লাল আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল, আপনার চোখ দুটী ভালবাসার মাদকতায় জড়িয়ে আসছে।

সেবারে বড়দিনের আগের দিনের ঘটনা আমার মনের মধ্যে বিরাট পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল; লজ্জাও এনেছিল কম নয়। তাঁর বাহুদ্বয়ের কোমলতার স্পর্শ ও কেশপাশের সুন্দর সুরভি অনুভব করার পর থেকে মনে হোল যেন আমার সেই কল্পিত ধ্রুবতারাটী চিত্তাকাশ থেকে খসে পড়লো; তার থেকে ক্রমবিকাশ লাভ করে দেখা দিল নারীরূপে, সুন্দরী রমণী হয়ে, তাঁর আপাদমস্তক যেন ভালবাসা আর প্রেম দিয়ে ঘেরা।

আমার দৃষ্টির মধ্যে একটা আকুলতার আমেজ ছিল। আমি নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক বলে ভর্ৎসনা করেছিলাম। আমার বিবেকের গ্লানি কিছুটা মুছে ফেলবার প্রয়াসে আপনাকে সেই অভিনেত্রী নারীর কবল থেকে ফিরিয়ে আনতে মনস্থ হয়েছিলাম। সৌভাগ্যবশত আমার হাতে কিছু অর্থও ছিল, যেটা আমি উত্তরাধিকারীরূপে লাভ করেছিলাম। আমি তাকে সেই অর্থ দিতে চাই, সে সেটা গ্রহণ করে খুসীই হয়েছিল।"

সৈনিক বন্ধুটী কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললেন—"বুঝেছি, বিয়ান্‌ক

তার চিত্তাকর্ষক বিদায়পত্রে আমাকে জানিয়েছিল, অতি কষ্টে ভগ্ন-হৃদয়ে সে আমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছে ; এজন্যে ত শুধু দায়ী আপনি, না?"

"হাঁ, আপনার কথা আমি সমর্থন করলাম। শুনুন, আরও বলি। আমি ভেবেছিলাম যে, সেই লালসাময়ী নারীকে অর্থ দিয়ে তার বিনিময়ে শান্তি ফিরে পেলাম ; কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলাম। আসুরিক পশুপ্রবৃত্তি আমার মনে এসে জট পাকাতে সুরু করলো। মন কিছুতে স্থির রাখতে পারছিলাম না। নিষ্কৃতি পাব এই আশায় কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম, কিন্তু মনে শান্তি এলো না।

বছর গড়িয়ে আবার সেই নতুন বছরের আগের দিনে এসে থামলো। অভ্যাসমত আবার একবার এইরকমভাবে তাঁর পাশে গিয়ে বসেছিলাম। আপনি সে সময় বাড়ীতে ছিলেন ; ক্লাবে নৈশ আনন্দের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পাশের ঘরের কৌচে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর খুব নিকটে বসে সেই ফ্যাকাসে সুন্দর মুখখানির দিকে তাকাতেই সেই বড়দিনের আগের দিনের স্মৃতির টুক্‌রোগুলো এসে মনের মধ্যে ভীড় করতে লাগল। আর একবার আমার কাঁধে তাঁর কেশপাশের স্পর্শ ও চুম্বন করার লালসা আমার হৃদয়কে অভিভূত করে ফেলল। ভাবলাম, বাসনা চরিতার্থ করে ফেলি। একটু পরেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টির বিনিময় হয়ে গেল। তাঁর চোখ দেখে মনে হোল, তিনি আমার গোপন বাসনাকে অনুভব করতে পেরেছেন। আমি কোন মতে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমি অভিভূত হয়ে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, আমার জ্বলন্ত মুখখানি তাঁর কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম। কিছুক্ষণ এইভাবে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলাম ; তারপর হঠাৎ তাঁর স্নেহ শীতল হস্তের স্পর্শ মাথায় অনুভব করলাম। তিনি যেন শান্ত সহজ স্বরে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "আপনি ভাল হয়ে উঠুন ; আপনার মনের ব্যাধি সেরে যাক।"

আমার বিবেকে ঘা লাগতেই আমি লাফিয়ে উঠে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম—"আমি এবার থেকে ভাল হবই। আমার নিদ্রিত বন্ধু যে আমায় এত বিশ্বাস করে তাকে আমি কিছুতেই বঞ্চনা করতে পারি না। তিনি টেবিল থেকে একখানি বই এনে আমার হাতে সমর্পণ করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর উদ্দেশ্য কি। আমি পাতাগুলি উল্টে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলাম, কি পড়েছিলাম তা জানি না। পাতার অক্ষরগুলো যেন আমার চোখের সামনে কেঁপে উঠতে লাগল। আমার চিত্তাকাশে যে ঝড়ের কলরোল উঠেছিল, ধীরে ধীরে সেটা থেমে এল, হৃদযে গ্লানির আভাস যেন মিলিয়ে যেতে লাগল। বারটা বাজতেই আপনি তন্দ্রাজড়িত চোখে আমাদেব নতুন বছরের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে উঠে এলেন, তখন আমার মনে হল, আমার মনের গ্লানি কোথায় মিলিয়ে গেছে। এই ঘটনার পর থেকে আমি হয়ে গেলাম শান্ত, স্থির। আমি জানি, তিনি আমার ভালবাসার প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নি। তাতে কি যায় আসে। এর পরে তাঁর কাছ থেকে আমিশুধু আশা করেছিলাম সহানুভূতি, মমতা।

বছরের পর বছর ঘুরে গেল, আপনার ছেলে মেয়েরা বড় হল, তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল। আমরা ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্যের দরজায় এসে পৌঁছলাম। আপনি আগের ব্যাভিচারী জীবন পরিত্যাগ করে একটী নারীর মধ্যেই চিত্ত স্থাপন করলেন। সে নারীর প্রতি আমার ভালবাসা কিছুমাত্র কমল না; কিন্তু এ ভালবাসা অন্যরূপ নিযে বসল। পার্থিব আকাজ্ক্ষা কেটে গিযে আমাদের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ঐক্যতান সংযোজিত হোল। আমরা যখন দার্শনিক তত্ত্ব নিযে আলোচনা করতাম, তা শুনে আপনি কী উপহাস করতেন। কিন্তু ভাবতে পারতেন যে, আমাদের আত্মায় আত্মায় মিলন সাধিত হযেছিল! এটা বুঝতে পারলে, আপনি হয়ত আমার উপর ঈর্ষান্বিত হতেন।

এখন তিনি গত হয়েছেন ; সম্ভবত সামনের বছরের এমনটী দিনে আমরা তাঁকে অনুসরণ করতে পারি। সেইজন্যে ভাবলাম, মনের গোপন কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করে হাল্কা হয়ে ওঠার এই উত্তম সময়।

একটু থেমে গদগদ কণ্ঠে আবার বলতে লাগলেন, "বন্ধু, আপনার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছি তার জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

সৈনিক বন্ধুটী বললেন—"কি যে বলেন, এর ভেতর ক্ষমা করার কি আছে? আপনি যে স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাটীর বর্ণনা আমার কাছে করে গেলেন, এ তো পুরণো ব্যাপার, আমি আগেই জানতাম। চল্লিশ বছর আগেই সে আমায় এ ঘটনাটী খুলে বলেছিল। আমি আরেকজন নারীর প্রতি এত গভীরভাবে আসক্ত হয়েছিলাম কেন, তার কারণ জানেন?

দার্শনিক বন্ধুটী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

সৈনিক বন্ধুটী আবার আরম্ভ করলেন—"সে আমায় যেদিন জানাল যে পৃথিবীতে আপনাকে ছাড়া অন্য কারুকে ভালবাসার কল্পনাই সে করতে পারে না, সেইদিন থেকেই আমি ওই রকম পথ বেছে নিয়েছিলাম।"

দার্শনিক বন্ধুটী মৌনাবলম্বী হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে উঠল।

ঝাণ্ডাওয়ালা

প্রত্যেক রবিবারে ঝাণ্ডাওয়ালা থিয়েলকে নিউজিটাউ চার্চের মধ্যে নিয়মিত সময়ে বসে থাকতে দেখা যেত। কোন রবিবারে অনুপস্থিত থাকলে বোঝা যেত, নিশ্চয়ই তার কোন একটা জরুরী কাজ পড়েছে অথবা সে পীড়িত। সুদীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে শুধু দুদিনের জন্য তার এই ব্যতিক্রম হয়েছিল। বাড়ীতে এ দুদিন অসুস্থ অবস্থায় সে শয্যা নিয়েছিল। একবার একটা দ্রুতগামী ইঞ্জিন থেকে একটা প্রকাণ্ড কয়লার টুক্‌রো বিদ্যুৎগতিতে ছিটকে এসে তার পায়ে লাগতেই সে ঠিকরে গিয়ে পড়ে খাদের মধ্যে। আরেকবার একটা চলন্ত এক্‌স্‌প্রেস থেকে একটা খালি মদের বোতল ছিট্‌কে এসে তার বুকে সজোরে লাগে। এই ছোট দুটী দুর্ঘটনার জন্য শুধু এই দুটো দিনই তাকে চার্চের প্রার্থনায় যোগ দিতে দেখা যায়নি। প্রথম পাচ বৎসর তাকে একা একাই স্কোরেন্‌টিন্‌ গ্রাম থেকে নিউজিটাউএ আসতে হত। তারপর এক সুপ্রভাতে একজন চপলা ক্ষীণাঙ্গী তরুণীর সঙ্গে তাকে দেখা গেল। স্বাস্থ্যবান থিয়েলের সঙ্গে ক্ষীণাঙ্গী নারীটীর এই অসামাঞ্জস্য মিলনকে কেউ অনুমোদন করতে পারেনি। তারপর এক রবিবার বিকেলে তারা দুজনে চার্চের বেদীতে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হল।

দুবছর এই ক্ষীণাঙ্গী নারীটীকে চার্চে থিয়েলের পাশে বসতে দেখা গেল। তার সুন্দর চিবুকখানি সেই পুরাতন চার্চের সঙ্গীত শ্রবণে নুয়ে পড়ত, তার পাশে থিয়েলের রৌদ্রদগ্ধ মুখখানিও দেখা যেত। হঠাৎ একদিন থিয়েলকে আগের মত একা বসে থাকতে দেখা যায়। এর মধ্যে একদিন মৃতা নারীটীর জন্য চার্চে শোকসূচক শব্দে ঘণ্টা বেজে ওঠে।

লোকজনেরা লক্ষ্য করলো, স্ত্রীর মৃত্যুতে তার অবয়বের কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। দেখা গেল, সে আগের মতই প্রতি রবিবারে চক্‌চকে পরিষ্কার পরিচ্ছদে নিজের দেহকে আবৃত করেছে। শুধু পরিবর্ত্তনের মধ্যে এইটুকু দেখা গেল, তার লোমশ গলাটী একটু সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, আর খুব দরদের সঙ্গে সমবেত ধর্ম্ম সঙ্গীতের সুরে তার গলা মিলিয়ে দিচ্ছে এবং একাগ্রচিত্তে ধর্ম্ম-যাজকের উপদেশবাণী শ্রবণ করছে। সর্ব্বসাধারণের মনে একটা ধারণা জন্মে গেল যে, স্ত্রীর মৃত্যু তার মনে সেরকম আঘাত দেয়নি। আবার দ্বিতীয়বার যখন সে দারপরিগ্রহ কোরল, তখন সে ধারণাটা সকলের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। দ্বিতীয়া স্ত্রীর স্বাস্থ্য ছিল অটুট। সে ছিল আল্‌তাগুন্‌দের গয়লানীর মেয়ে।

থিয়েল যখন তার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে ধর্ম্মযাজকের কাছে যায় তিনিও একথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারেন নি। ধর্ম্ম-যাজক বললেন —এত তাড়াতাড়ি আবার বিবাহের কথা কেন ; সে গত না হতে হতেই এত শীঘ্র তুমি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ ?

থিয়েল—আমার স্ত্রী তো গত হলেন, এখন কি ভাবে সংসার বজায় রাখি বলুন ?

ধর্ম্ম-যাজক উত্তর দিলেন,—তুমি দেখছি বিয়ের জন্য অসম্ভব রকম ব্যস্ত হয়েছ।

থিয়েল—শুধু ওই বাচ্চা ছেলেটার জন্যেই আমায় বিয়ে করতে হচ্ছে।

শিশুটীর জন্ম হবার সঙ্গেই থিয়েলের স্ত্রী মারা যায়, শিশুটী জীবিতই ছিল, তার নামকরণ হয়েছিল টোবিয়াস। ধর্ম্ম যাজক বললেন, আমি ওই কথাটা উত্থাপন করার সঙ্গেই তোমার খোকার কথা মনে হোল নাকি ? এতদিন তুমি কাজে যাবার সময় শিশুটার কি ব্যবস্থা করে যেতে ?

উত্তরে থিয়েল জানালো যে সে টোবিয়াসকে একটী বৃদ্ধা নারীর

তত্ত্বাবধানে রেখে কাজ করতে যেত। অযত্ন, অবহেলার জন্য শিশুটী একদিন আগুনে হাত পুড়িয়ে ফেলে ; আর একদিন বৃদ্ধার কোল থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়। এ অবস্থায় তার দিন কাটান অসম্ভব হয়ে উঠে। ছেলেটী একেবারেই বাচ্চা, আর দুর্ব্বল, তার যত্নের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। সে তার স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল যে তার অবর্ত্তমানে শিশুটীর কোনই অযত্ন হবে না ; তার তত্ত্বাবধানের জন্যই আবার সে বিবাহ করবে।

লোকেরা আর এই বিবাহিত দম্পতিকে নিয়ে বাজে হাল্কা আলোচনায় মনোনিবেশ করে না। গয়লানীর মেয়েটীকে দেখে মনে হত যেন ঝাণ্ডা-ওয়ালার জন্য মাপ দিয়ে তাকে গড়ান হয়েছে। দুজনকেই মানাত বেশ। সে দীর্ঘতায় ঝাণ্ডাওয়ালার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ছোট ছিল বটে, কিন্তু চওড়ায় তাকে ছাপিয়ে যেত। দেহ তার স্বামীর মতই শক্ত, মজবুত ছিল, কিন্তু তার মনের মধ্যে ছিল সৌন্দর্য্যবোধের একান্ত অভাব। বিবাহের বিনিময়ে এই কয়েকটী বিষয় ছাড়া তার আরও তিনটী গুণের সঙ্গে থিয়েল পরিচিত হতে লাগলো ; যেমন—তার প্রভুত্ব করবার ইচ্ছে, ঝগড়াটে প্রকৃতি আর আসুরিক যৌন-প্রবৃত্তি। ছ'মাসের মধ্যে প্রতিবাসীরা জেনে গেল, ঝাণ্ডাওয়ালার গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রীটী কে।

থিয়েলের জন্য সকলে সহানুভূতি প্রকাশ কোরত। অন্যান্য পরিবারের কর্ত্তারা বলতেন, মেয়েটির খুবই ভাগ্য ভাল যে এমন নিরীহ স্বামীর হাতে পড়েছে ; অন্য লোকের উপর সে এতটা প্রভুত্ব করতে সাহস পেত না। অন্য লোক হলে মাগীটাকে উত্তম মধ্যম প্রহার খেতে হোত। এই রকম আসুরিক প্রকৃতির নারীকে সায়েস্তা করতে গেলে চাবুকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

থিয়েলের উন্নত বুক, পেশীবহুল হাত থাকা সত্ত্বেও সে কোনদিন স্ত্রীকে

মারতে চেষ্টা করেনি। মারধোর করার মত প্রকৃতি তার ছিল-না। নারীটির আচরণে প্রতিবাসীরা বিরক্ত হলেও থিয়েলের প্রকৃতির মধ্যে কোনি পরিবর্ত্তন দেখা যায়নি। স্ত্রীর কর্কশ ছোটখাট অভিযোগ সে নীরবে শুনে যেত, কোন উত্তরই দিত না। যদি কখন থিয়েল মৃদুস্বরে এর সমালোচনা কোরতে চেষ্টা করত, প্রত্যুত্তরে নারীটী কর্কশ স্বরে হৈ চৈ লাগিয়ে দিত।

বাহরের জগতের সঙ্গে থিয়েলের যোগাযোগ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্তরে একটা গুরুভার সদা সর্ব্বদা সে বহন করে চলতো, থিয়েল ছিল একেবারে শান্ত প্রকৃতির ; কিন্তু শিশু টোবির প্রতি একটু অযত্ন হলে কিছুতেই সে তা সহ্য করতে পারত না ; থিয়েলের শিশু সুলভ কোমলতা, বশ্যতাসূচক প্রকৃতি এমন এক উগ্ররূপ ধারণ কোরত যে হিংস্র প্রকৃতির লেনাও সে সময় তার মুখের উপর একটা কথা বলতে সাহস পেত না।

বিবাহের প্রথম বছরে থিয়েল লেনার অন্যায় আচরণে খানিকটা বাধা প্রদান কোরত। দ্বিতীয় বছর থেকে এ অভ্যাসও থিয়েল ছেড়ে দিল। প্রায়ই থিয়েল স্ত্রীকে তার প্রতি সদয় হতে অনুরোধ কোরত। ব্র্যাডেন্-বার্গের ঘন দেবদারু বনস্থিত নির্জ্জনতাপূর্ণ কর্ম্মস্থলটি তার কাছে স্বর্গের সমান মনে হত ; সে অনুভূতি সে এখন হারিয়ে ফেলেছে। বর্ত্তমান স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময়, গত পত্নীর সকরুণ মূর্ত্তিটী তার মানসচক্ষে ভেসে উঠত। সে যে অনিচ্ছাসত্ত্বে কর্ম্মস্থল থেকে বাড়ীর দিকে ছুটতো তা নয়, এই চলার গতির মধ্যে কেমন যেন একটা উন্মাদনা সে অনুভব কোরত। তার প্রথমা স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার আমেজ ছিল ; কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর মধ্যে এই অভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পেত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে থিয়েল তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মনের

নিরানন্দকে মুছে ফেলবার জন্য থিয়েল অনেক রকম উপায় অবলম্বন কোরতে থাকে। কর্ম্মস্থানের ঘরটিকে সে খুব পবিত্র মনে করে, কারণ তার মধ্যে গত স্ত্রীর স্মৃতির দিনগুলিকে সে ফিরে পায়। নানারকম ওজর দেখিয়ে থিয়েল স্ত্রীকে কর্ম্মস্থানের পথে অনুসরণ কোরতে প্রতিনিবৃত্ত করে। থিয়েলের কর্ম্মস্থলের ঘরগুলি এবং তাদের অবস্থিতির সম্বন্ধে মহিলাটি অজ্ঞাত ছিল!

দিবাভাগে কর্ত্তব্যের সময় গত স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে তার একটা আধ্যাত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হত। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঝড় এসে যখন পাইন বনটাকে আলোড়িত করতো, সেই সময় ঘরের লণ্ঠনের মৃদু আলোতে ঘরটা ধর্ম্মমন্দিরের রূপ নিত। টেবিলের উপর গত স্ত্রীর ছবিটি সে সাজিয়ে রেখেছিল। সময় সময় বাইবেল হাতে নিয়ে উপদেশ বাণী পাঠ করে যেত, আবার কখনও বা ধর্ম্মসঙ্গীত গেয়ে সারা রাতই কাটিয়ে দিত। এই সময় তার মনে এমন একটা আনন্দের উপলব্ধি হত যে প্রথমার উপস্থিতিই যেন সে অনুভব করতো। এইভাবে নির্জ্জন কর্ম্মস্থানটার রহস্য ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ পারিপার্শ্বিকে থিয়েলের দশ বছর কেটে গেল।

লোকালয় থেকে তার কর্ম্মস্থলের ঘরটি ছিল কুড়ি মিনিটের পথ। ঘন বনের মধ্যে ছিল তার ঘরটা। তার সামনেই ছিল রেলের গুমটী। গুমটীর গেটটাকে ওঠানো নামানোই ছিল থিয়েলের কাজ। শীতকালের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি এইভাবে সে একাই কাটিয়ে যাচ্ছিল। কখনও বা দু একটা শ্রমিককে লাইনের কাজে নিযুক্ত দেখতে পেত।

চার বছর আগে এই ঘন বন ও থিয়েলের ঘরের নির্জ্জনতাকে ভঙ্গ করে ব্রেস্‌লো গামী কাইজারের ট্রেন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়েছিল; আর একবার একটা দ্রুতগামী ট্রেন একটা হরিণকে চাপা দিয়ে যায়। এইসব ছোটখাট ঘটনা ঝাণ্ডাওয়ালাদের মনে বেশ একটু বৈচিত্র্য এনে দেয়।

থিয়েলের ঘরের পাশে ছিল একটী ঝরণা। সময় সময় লাইনে কর্ম্মরত শ্রমিকরা এসে তা থেকে জল পান করতো এবং খানিকটা হয়ত বিশ্রাম নিয়ে পরস্পরে আলাপ আলোচনা করতো। এই সব দৃশ্য তার একঘেয়ে জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আনে।

ধীরে ধীরে শিশুটী বাড়তে লাগলো। দু' বছর বয়স হতে না হতেই হাঁটতে ও কথা বলতে শিখলো। শিশুটীর চাহনি থেকে মাঝে মাঝে একটা পিতৃ অনুরাগের আভাস ফুটে বেরুত। পরের বছর তাদের আর একটী সন্তান লাভ হতে লেনার মনে টোবির প্রতি একটা বিদ্বেষ এনে দেয়; কিন্তু থিয়েলের স্নেহ দ্বিগুণতর হয়ে ওঠে। লেনা মনে মনে টোবিয়াসকে অভিশাপ দেয় কিন্তু সামনে কিছু বলতে সাহস করে না।

একদিন থিয়েল তার রাত্রির কর্ত্তব্য সমাধা করে সকাল সাতটায় বাড়ীতে ফিরলো। লেনা অভ্যাসমতো নানারকম অভিযোগ তার কাছে উপস্থিত করলো। কিছুদিন আগে তাদের ভাড়াটে জমির মালিক নোটীশ পাঠিয়েছিল, আর তারা তাদের জমিতে আলুর চাষ করতে পাবে না। এ জমি ছাড়া অন্য জমি সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জমি চাষের ভার লেনার উপরেই ছিল। এই ব্যাপারে থিয়েলকে লেনার কাছ থেকে অনেক কটু কথা শুনতে হয়েছিল। এর উত্তরে সে একটীও কথা না বলে বিছানায় গিয়ে ঘুমন্ত শিশুর মুখের ওপর একাগ্র-চিত্তে তাকিয়েছিল। মাঝে মাঝে তার মুখের ওপর থেকে হাত দিয়ে মাছি তাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে সে টোবিয়াসের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। অপূর্ব্ব আনন্দে শিশুটীর চোখ দুটী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। থিয়েল তার অসংলগ্ন জামা-কাপড়গুলিকে ঠিক করে পরিয়ে দেয়। হঠাৎ তার লক্ষ্য পড়ে যে শিশুটীর ডানদিকের গাল ঈষৎ ফুলে উঠেছে, তাতে আঙ্গুলেরও

গেন দু একটা দাগ বসে গেছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেই জমি নিয়ে কিছু তর্ক বিতর্ক হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ মনোহারী ফিরিওয়ালার ঘণ্টার আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে লেনা ছুটে গেল, কি রকম নতুন জিনিস এসেছে দেখতে। থিয়েল তখন টোবিয়াসকে নিয়ে মসগুল হয়েছিল; খোকা বাবার কোলে বসে পাইন ফল নিয়ে খেলা করছিল।

থিয়েল খোকাকে জিজ্ঞাসা করে,—বাবু, তুমি বড় হয়ে কি হবে? টোবিয়াস তার শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে উত্তর দেয়—কেন, রেল-রোড ইন্‌স্পেক্টর হব, বাবা। খোকার এই উত্তরে থিয়েলের বুকটা আনন্দে ফুলে ওঠে; সে ভাবে, ঈশ্বরের কৃপায়, টোবি আমার বড় কিছু একটা হয়ে উঠবে। থিয়েল বলল, "যাও বাবা, এখন খেল গে, কেমন।" পোষাক পরিচ্ছদ খুলে ঝাণ্ডাওয়ালা খানিকটা আরামের সঙ্গে ঘুমিয়ে নিল। বারোটার একটু আগেই তার ঘুম ভেঙে যায়। লেনা তখন মধ্যাহ্নের আহার্য্য তৈরী নিয়ে ব্যস্ত। থিয়েল পরিচ্ছদ পরিধান করে টোবিয়াসের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে দেখে, সে এক টুক্‌রো ভাঙা সিমেণ্ট মুখে পুরেছে।

থিয়েল খোকার হাত ধরে পর পর গ্রামের আটখানি বাড়ী পেরিয়ে একটা ছোট পাহাড়ে নদীর ধারে এল। নদীর কালো জলের ধারা কাঁচের মত স্বচ্ছ। ধারে ধারে পপ্‌লার গাছের সারি। ঝাণ্ডাওয়ালা জলের ধারে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে পড়ল, প্রত্যেক হাটের দিন গ্রামবাসীরা তাকে ঠিক এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখতে পায়। গ্রামের ছেলেরা তাকে খুব ভালবাসে আর 'ফাদার থিয়েল' বলে ডাকে; থিয়েল তাদের নানারকম খেলা শেখায়, টোবিয়াসের জন্য ধনুক তৈরী করে দেয়। এ ছাড়া তাদের জন্য অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজও সে হাতে নেয়। বড়দের

সে পড়া শোনে, বাইবেল পড়ায় তাদের সাহায্য করে, আবার উচ্চারণও শেখায়।

মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে থিয়েল কিছুটা সময় বিশ্রাম নিত; তারপর এক পেয়ালা কফি পান করে কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিত। জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিতে তার বেশ একটু সময় লাগলো। টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখা ছবি, নোট্‌বুক, চিরুণী, পকেট ঘড়ি আর লাল কাগজে মোড়া থিয়েলের নামে একটা সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশ বই সে তার বিভিন্ন পকেটের মধ্যে পুরে নেয়। সেদিন ঠিক চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় সে বেরিয়ে পড়ে। তার নিজের নৌকোতে নদীটি পার হয়ে যায়; তারপর চওড়া বনপথ ধরে চলতে আরম্ভ ক'রে কয়েক মুহূর্ত্তেই গভীর পাইন বনের মধ্যে এসে পড়ে। কখনও দীর্ঘ পুরোণো গাছের পাশ দিয়ে, কখনও বা সবুজ পত্রশোভিত ছোট ছোট পাইন শ্রেণীর মধ্য দিয়ে সে চলতে থাকে। মাটী থেকে সর্পিল রেখার আকারে উত্তপ্ত বাষ্প উঠে গাছগুলোকে ঝাপ্‌সা করে দেয়। মাঝে মাঝে বাতাসের সঙ্গে পাইনের একটা সুগন্ধ সে অনুভব করে। বৃক্ষ-শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে নীল আকাশ উঁকি ঝুঁকি মারে।

প্রকৃতি থেকে তার চিন্তাটা হঠাৎ অন্যদিকে ফিরে যায়, তার মনে হয়, কি যেন একটা জিনিস সে বাড়ীতে ফেলে এসেছে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে স্যাণ্ডউইচের টুকরোগুলি আনতে ভুলে গিয়েছে। ওই খাদ্যগুলির তার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ তার সেদিন কাজের মাত্রা ছিল অত্যন্ত বেশী। প্রথমে সে কি করবে ভেবে পেল না; তারপর সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাই মনস্থ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে নদীর ধারে এসে নৌকোয় উঠে নিজেই সেটাকে চালিয়ে, তাদের

গ্রামের পথের ধারে এসে পৌঁছল। একটা উচ্চগ্রামের স্বরে সেখানকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়ে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও থিয়েল দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা বিশ্রী কর্কশ স্বর তার কানে এসে বাজে ; তার বুঝতে বিলম্ব হয় না যে সে স্বরটী কোন্ গৃহ থেকে আস্ছে। ধীরে ধীরে পা টিপে কুটীরটীর নিকটে এগিয়ে এল ; এখন সে নিশ্চিত করে জানলো যে সেটা তার স্ত্রীরই কণ্ঠস্বর।

টোবিয়াসকে লেনা অত্যন্ত তিক্ত ও কটুভাবে ভৎ‍র্সনা করে বলে উঠল, "এই কুকুরছানা, তুই কি ভাবিস্ যে তোর জন্মে আমার ছেলে না খেয়ে মরবে? মুখ বন্ধ কর্, না হ'লে মেরে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব।" মনে হল টোবিকে মারধোরও যেন সে করেছে। রাগে থিয়েলের সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে শুনতে পায়, তার স্ত্রী গলা দিয়ে যেন জ্বলন্ত অগ্নি উদ্গীরণ করছে।

থিয়েল আর স্থির থাকতে পারলো না, চীৎকার করে সে বলে উঠলো, —"তুমি আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে চাও, বর্ব্বর কোথাকার? এই অসহায় শিশুকে মারতে তোমার একটু বাধলো না?" ঘৃণামিশ্রিতস্বরে আবার সে বললো,—"জান, আমি তোমায় মেরে সায়েস্তা করতে পারি। না, তা আর করতে চাই না।"

সেই মুহূর্ত্তেই সামনের দরজাটা খুলে গেল। ভীতা রমণীর মুখ থেকে আর একটীও কথা বেরুল না ; রাগে তার নিজের ঠোঁট দুটী কামড়াতে আরম্ভ করে। খোকার দুধের বোতলে দুধ ঢালতে গিয়ে বেশী অংশটাই বাইরে পড়ে যায়। আস্তে আস্তে সে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বামীকে কর্কশস্বরে এই অসময়ে বাড়ী ফেরার কারণ জিজ্ঞাসা করে,—"আমার

আচরণকে সন্দেহ ক'রে এই রকম লুকিয়ে লুকিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে আসা হয়, না?"

থিয়েলের মনের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রকমের একটা উত্তেজনার ঝড় উঠছিল তাকে সে সংযত করে ফেলল। তার বলিষ্ঠ দেহের শিরা উপশিরাগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা উগ্র কামার্ত্ত ভাব তার চোখের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় মহিলাটির নিটোল পযোধর— যুগল শাসন না মেনে কর্সেট্ ফুটে বেরিয়ে আসতে চায়; তার স্কার্টের ভেতর থেকে চওড়া নিতম্ব দুটী পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। লেনার মধ্য থেকে একটা ভয়ানক রকমের তেজ বেরিয়ে আসছিল। থিয়েল অনুভব করলো, এ থেকে তার নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় নেই; যেন মাকড়সার জালের মত ইস্পাতের পাত দিয়ে নারীটী থিয়েলকে ঘিরে রেখেছে।

থিয়েল স্ত্রীকে আর কিছু বলতে সাহস করলো না। সে আস্তে আস্তে বেঞ্চের কাছে গিয়ে কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে স্যাণ্ডউইচ্গুলি সংগ্রহ করে, তার স্ত্রীকে ঘরে ফিরে আসার কারণ জ্ঞাপন করে, অভিনন্দন জানিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

খুব দ্রুতগতিতে থিয়েল তার নির্জ্জন কর্ম্মস্থলের দিকে রওনা হলো। তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছতে অন্যদিনের থেকে পঁচিশ মিনিট বিলম্ব হয়ে গেল। থিয়েলের সহকারী লোকটী কাসির অসুখে ভুগছিল, সে থিয়েলের আগমন প্রতীক্ষায় এতক্ষণ বসেছিল। এইবার তারা দুজনে করমর্দ্দন করে বিদায় গ্রহণ করলো। থিয়েল ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে রাত্রির ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্রগুলি নিজের ইচ্ছামত গোছগাছ করে নিতে লাগলো। প্রথমে সে জানালার ধারের বাদামী টেবিলের ওপর রাত্রের খাবার

দাঁড়িয়ে রাখলো ; তারপর আলোটা পরিষ্কার করে, তার মধ্যে তেল ভরে দিল।

সিগন্যাল্ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েল অভ্যাসমত ঝাণ্ডা ও কার্টরিজের বাক্স হাতে নিযে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একটু অলসতার সঙ্গে সে গুম্‌টীর কাছে হেঁটে গেল। যদিও সেখানে লোক চলাচল একেবারে ছিল না, তবুও সে নিয়মমত গেটটা নামিয়ে দিল, এবং ট্রেণ চলে যাওয়ার পর সেটা উঠিয়ে দিল।

এই কাজটা সমাপ্ত করে সে সাদা রং করা মাইলপোষ্টএর ওপর অলসভাবে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কালো লাইনগুলি সাপের মত এঁকে বেঁকে কোথায় গিয়ে মিশে গেছে। টেলিগ্রাফের তারগুলি থেকে একটা সুর ভেসে আসে। অস্তগামী সূর্য্যের আভায় বনানীর শীর্ষভাগ রক্তরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। ঝাণ্ডাওয়ালা নিস্তব্ধ হযে এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছিল। সে কিছুদূর এগিয়ে গেল। দূর দিগন্তে বিন্দুর মত কি একটা দেখা গেল ; ক্রমশঃ সেটা তীব্র গতির সঙ্গে এগিয়ে আসে ; একটা ছন্দময় কম্পিত সুর লাইনের উপর দিয়ে ভেসে যায় ; ক্রমশঃ আওয়াজটা আরও স্পষ্টতর হতে থাকে। যেন মনে হতে লাগল সহস্র ঘোড় সওয়ার ঝড়ের মত তীব্রবেগে ছুটে আসছে। কী ভীষণ আর্ত্তনাদ ! মনে হোল, একটা বিরাট দৈত্য বিকট আওয়াজ করে, মাটি কাঁপিয়ে, ধূলো উড়িয়ে ধোঁয়ার রাশি উদগীরণ করতে করতে বিদ্যুৎগতিতে সামনে দিয়ে ছুটে গেল। আস্তে আস্তে আওয়াজটা আবার ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে আরম্ভ করলো ; ট্রেণখানি চোখের আড়ালে মিশে গেল। অরণ্যের স্তব্ধতা আবার ফিরে এল।

ঝাণ্ডাওয়ালা কুটীরের মধ্যে ফিরে এসে এক কাপ কফি বানিয়ে

চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলো। ধীরে ধীরে এক প্রকারের অস্থিরতা এসে তার মনকে চঞ্চল করে তোলে। ঘরে গরম লাগাতে গায়ের জামা খুলে ফেলে সে ঘরের কোণ থেকে কাস্তে নিয়ে ইন্স্পেক্টর প্রদত্ত জমিটির দিকে এগিয়ে যায়। জমিটা আগাছায় পূর্ণ ছিল। থিয়েল কাস্তে দিয়ে আগাছাগুলি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলো। অনেকটা সময় তার এইভাবে কেটে যায়, তারপর আস্তে আস্তে কাস্তেটা তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে আসে। আবার যেন তার মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার মনে হোল, এই কর্ত্তব্যের স্থানে লেনার উপস্থিতি, তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠবে। তার ধর্ম্মমন্দিরের পবিত্রতাকে যদি কেউ নষ্ট করে ফেলতে চেষ্টা করে, সেই অমূল্য সম্পদকে তার প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতেই হবে —এই কথা তার বারে বারে মনে হতে থাকে। তার হাতের মাংসপেশীগুলি আপনা থেকেই ফুলে উঠল, একটা অট্টহাসি মুখের ওপর দিয়ে খেলে গেল, চিন্তাধারার যোগসূত্রগুলি সে যেন আবার হারিয়ে ফেললো। সেদিন দ্বিপ্রহরে সন্তানের প্রতি উৎপীড়নের কথা বারে বারে তার স্মৃতির পটে এসে ঘা দিতে থাকে। তার মনে হতে লাগল যে সন্তানের প্রতি যে অত্যাচার অবিচার চলেছিল, তার প্রতিবিধান সে কখনও করেনি। করুণায়, দুঃখে ও লজ্জায় তার হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। এইভাবে চিন্তা করতে করতে থিয়েল কখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লো। ঘুমের ঘোরে সে মাঝে মাঝে ডাকছিল 'মিন্না, মিন্না' বলে।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হওয়াতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল; সারা ঘরটা যেন অন্ধকারে ভরে এলো। ভয়ে, আতঙ্কে সে বিছানা থেকে উঠে পড়লো। বাইরের বনের মধ্য থেকে সমুদ্র গর্জ্জনের মত একটা আওয়াজ

আসছিল ; ঝড় ও বৃষ্টির প্রচণ্ড ঝাপটা এসে কাঁচের জানালার উপর ঘা দিতে লাগল। তারপর চোখ ঝলসানো একটা আলো এসে সারা ধরিত্রীকে আলোকিত করে আবার মিলিয়ে গেল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে সে আলোটা খুঁজে বেড়াতে লাগলো। এর একটু পরেই আকাশের এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত একটা গভীর নীল রেখা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো। প্রথমে একটু গুরু গুরু আওয়াজ সুরু হয়ে সেটা কামান গর্জ্জনের মত ভীষণ শব্দে পরিণত হয়ে মেদিনীকে কাঁপিয়ে দিল। জানালার কাঁচগুলি ঝন্‌ঝন্ শব্দে বেজে উঠলো।

আলোটা জ্বালিয়ে থিয়েল ঘড়ির দিকে তাকায়। পাঁচ মিনিট পরেই একটা ট্রেণ আসার কথা। তার মনে হোল—গাড়ীর বংশীধ্বনি সে শুনতে পায়নি। এই ভেবে সে ঝড় ও অন্ধকার ভেদ করে অবিলম্বে গুমটীর দিকে অগ্রসর হয়। থিয়েল গেটটা নামিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণের বংশীধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। কিছু পরেই টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের ফাঁক দিয়ে চন্দ্রমার আবির্ভাব হয়। আবছা চাঁদের আলোয় বৃক্ষের শীর্ষাগ্রের কম্পায়মান পত্রদলগুলিকে দেখা যেতে লাগলো। থিয়েল মাথার টুপি নামিয়ে ফেললো। বর্ষণের স্পর্শে সে কিছুটা আরাম বোধ করে।

বৃষ্টির ধারার সঙ্গে তার চোখের জল মিশে একাকার হয়ে গেল। টোবিয়াসের প্রতি অত্যাচারের দৃশ্যটা যেন তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আরও যেন মনে হোল তার গত স্ত্রী রেলের লাইন ধরে ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে। ছিন্ন বসনে তাকে খুব দুর্ব্বল ও পীড়িত বলে মনে হচ্ছে। কোনদিকে না চেয়ে সে যেন ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করলো। এইখানেই তার স্মৃতিশক্তি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। তার মনে হচ্ছিল, তার

প্রথমা স্ত্রী যেন হাওয়ার ওপর দিয়ে বিচরণ করছে ও কাপড়ে মুড়ে একটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড বহন করে চলেছে; তার চাহনি থিয়েল্কে অতীত দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিল,—সেই মুমূর্ষু নারী, যেন স্থির, সকরুণ নেত্রে তার নবজাত শিশুটীর দিকে ব্যথাপূর্ণ হৃদয়ে তাকিয়ে ছিল। এ দৃশ্যটা যেন তার প্রাণে গাথা হয়ে গিয়েছিল, কিছুতেই সে তা ভুলতে পারছে না। হঠাৎ কোথায় সে মিলিয়ে যায়, থিয়েল কিছুই ঠিক করতে পারে না। "মিন্না, মিন্না" করে সে চেঁচিয়ে ওঠে আর নিজের কণ্ঠস্বর তার কাণে প্রবেশ করতেই সে জেগে ওঠে।

দুটী গোল লাল আলো যেন একটা বিরাটকায় দৈত্যের বিকট ও স্থির চাহনির মত অন্ধকার ভেদ করে ছুটে আসছিল। একটা উজ্জ্বল রক্তাভ আলো যেন বৃষ্টি বিন্দুকে রক্তধারায় পরিণত করছিল। মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে রক্তধারার বর্ষণ হচ্ছে। ট্রেণটা যতই এগিয়ে আসে, থিয়েলের মনে ততই একটা ভয়ের উদ্রেক হতে থাকে। এখনও যেন থিয়েল দেখতে পাচ্ছে যে তার স্বর্গগতা স্ত্রী লাইনের ওপর দিয়ে বিচরণ করছে। যেন চলমান ট্রেণটীকে থামাবার জন্যই তার হাতটা কার্টরিজটার দিকে হঠাৎ এগিয়ে এলো। বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার চোখের ওপর আলো ফেলে ট্রেণটা দ্রুতগতিতে চলে গেল। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু মনে অশান্তি নিয়েই কাটল। শিশু টোবিকে দেখবার জন্য তার মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, মনে হলো কতদিন যেন সে তাকে দেখেনি। শিশুটী কি অবস্থায় আছে এই চিন্তা তার মনে বারে বারে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। সকাল ছ'টায় তার ছুটী হবার পর একটুও বিলম্ব না করে সে ঘরের দিকে ছুটে চললো।

রবিবারের উজ্জ্বল প্রভাত। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ফর্সা হয়ে

এলো। সূর্য্যদেবকে দেখাচ্ছিল যেন একটা জ্বল্‌জ্বলে রক্তবর্ণের পাথরের মত; তার রক্তিম আলোতে সারাটা বন রাঙ্গিয়ে গেল। ক্রমশঃ আলোটা উজ্জ্বল হয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে প্রবালের আকার ধারণ করছিল; সারা বিশ্বটা যেন আলোর খেলায় মেতে উঠলো। এই মধুর আলোর স্পর্শে থিয়েলের রাত্রির জড়তা ক্রমশঃ কমতে আরম্ভ করলো। যখন সে ঘরে ঢুকে রৌদ্রে উদ্ভাসিত টোবির ঘুমন্ত মুখখানি আবিষ্কার করলো, সেই মূহূর্ত্তেই যেন তার রাত্রির ঘোর ভাবটা একেবারে কেটে গেল।

লেনা সেদিন থিয়েলের আচরণে একটা অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে। সেদিন চার্চে থিয়েলের দৃষ্টি বইএর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, অন্য-দিকে সে তাকিয়ে ছিল। দিনের বেলায় কাজ থাকায় থিয়েল রাত্রি ন'টার মধ্যেই শুয়ে পড়ে; ঘুম আসবার ঠিক আগেই লেনা পরের দিন সকালে থিয়েলের সঙ্গে গিয়ে জমিটা খুঁড়ে আলুর চাষ করবার ইচ্ছা জানায়। থিয়েল নড়ে উঠল; ঘুম আর গেল না; কিন্তু ঘুমোবার ভাণ করে পড়ে রইল। লেনা বলে যেতে লাগলো,—এই ঠিক চাষ করবার সময়, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। উত্তরে থিয়েল অস্পষ্টভাবে কি যেন বললো। তারপর লেনা পাশ ফিরে মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় কর্সেট্‌ আল্‌গা করে, দেহ থেকে স্কার্ট্‌কে সরিয়ে ফেলে দিল। অজান্তে হঠাৎ লেনা ঘুরে গিয়ে আবিষ্কার করলো যেন কি একটা কামদগ্ধ বেদনায় তার মুখটা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। থিয়েল শরীরটা কিছু পরিমাণ তুলে বিছানার কোণে হাত দুটী রেখে শরীরের ভার রক্ষা করলো। তার জলন্ত চোখদুটী লেনার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। সে তখন কিছুটা রেগে, কিছুটা ভয় পেয়ে থিয়েলের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠলো। এতে থিয়েলের

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল ; কি যেন অস্পষ্ট স্বরে ব'লে, বালিশের উপর মাথা রেখে, কম্বলে কাণ পর্য্যন্ত দেহকে আবৃত করে আবার সে শুয়ে পড়লো।

প্রত্যুষে সকলের আগে লেনাই জেগে উঠলো। কল্পিত অভিযানের জন্য সে নীরবে সবরকম ব্যবস্থা করতে মনোনিবেশ করলো। ছোট শিশুটাকে দোলনা গাড়ীতে বসিয়ে দিযে টোবিয়াসকে তুলে তার পোষাক পরিয়ে দিল। বেড়াতে যাবার কথা শুনে টোবিয়াসের মুখ খুসীতে ভরে গেল। যখন সব রকম ব্যবস্থা হয়ে গেছে আর টেবিলে কফি সাজান হয়েছে, ঠিক সেই সময় থিয়েল জেগে উঠলো।

অভিযানের এই ব্যবস্থা দেখে থিযেলের মন কিন্তু নিরানন্দে ভরে গেল। সে ভেবেছিল, তার সঙ্গে লেনার অনুগমনের পথে সে বাধা নিশ্চয়ই দেবে, কিন্তু আবার ভাবল, কি বলে সে লেনাকে বাধা দেবে। আবার ছোট শিশুটীর মুখ থেকে খুসির হাসি ফুটে বেরুতে দেখে আনন্দের মাত্রা ক্রমশঃ তার বেড়েই;চললো। স্ত্রীর গমনের পথে থিয়েলের আর বাধা দেওয়া হোল না।

লেনা বনপথ দিয়ে ছোট শিশুটীকে ঠেলা গাড়ীতে করে উঁচু নীচু জায়গা দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল টোবিয়াস ফুল সংগ্রহ ক'রে শিশুটীর গাড়ীতে রাখছিল। তার মুখ এত উজ্জল দেখাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন এত আনন্দের স্বাদ সে কখনও পায়নি। সে ছোট বাদামী রঙের টুপি মাথায় দিয়ে এদিকে ওদিকে ছুটে উড়ন্ত প্রজাপতি ধরবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছানর পর লেনা জমিটীর চারিধারে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিল। তারপর বস্তা খুলে আলুর বীজগুলোকে ঘাসের

ওপর ঢেলে ফেলে হাঁটু গেড়ে বসে আঙ্গুল দিয়ে মাটির উর্ব্বরতা অনুভব করতে লাগলো।

থিয়েল লেনাকে জিজ্ঞাসা করলো—কেমন জমি বলতো ?

লেনা বললো—ঠিক নদীর ধারের জমির মত উর্ব্বর। থিয়েল ভেবেছিল যে লেনার হয়তো জমিটা ভাল লাগবে না, কিন্তু তার জমিটা পছন্দ হওয়ায় থিয়েলের মন থেকে একটা দুশ্চিন্তার ভার নেমে গেল।

মহিলাটী তাড়াতাড়ি মোটা এক টুকরো রুটী খেযে নিয়ে, মাথার টুপি ও জামার ওপরের কোটটা খুলে ফেলে একধারে সরিয়ে রাখলো ; তারপর কাস্তে দিযে মেসিনের মত দ্রুতগতিতে জমি খুঁড়তে আরম্ভ করে দিল! পরিশ্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝে তাকে থামতে হচ্ছিল, আর তার বুক থেকে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল। এর মধ্যে একটু সময় করে তার ঘর্ম্মাক্ত বুক থেকে শিশুটিকে দুধ খাইযে দিচ্ছিল। কিছু পরেই ঝাণ্ডাওয়ালা তার ঘরটীর সাম্‌নে থেকে লেনাকে সম্বোধন করে বললো—আমাকে এখনই লাইন পরীক্ষা করতে যেতে হবে ; টোবিয়াসকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। মহিলাটী আপত্তি জানাল, সে টোবিকে নিযে গেলে, কে তার ছোট শিশুকে সামলাবে ?"

থিয়েল স্ত্রীর কথায় কাণ না দিয়ে টোবিকে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ে লাইন ধরে চলতে আরম্ভ করলো। আনন্দের উত্তেজনায় বালকটীর মন ভরে গেল ; এটা যেন তার কাছে একটা নতুন জগতের মত ঠেকলো। রৌদ্রদগ্ধ সরু সরু লাইনগুলি দেখে সে কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না, এর প্রয়োজনীয়তা কি হতে পারে। এই নিয়ে সে বাবাকে নানা রকমের কৌতূহলজনক প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। টেলিগ্রাফের তারের মৃদু আওয়াজ তার কাছে সব চেয়ে বিস্ময়কর বোধ হচ্ছিল। টোবিয়াস টেলিগ্রাফের

স্তম্ভের কাছে ছুটে গেল। তার মনে হোল, এর মধ্যে কোন ছিদ্র দিয়ে এই সুন্দর গুঞ্জন ধ্বনির স্রষ্টাকে, যদি সে আবিষ্কার করে ফেলতে পারে। চার্চে সঙ্গীতের মধ্যে থিয়েল যেমন ডুবে যেত, এই শব্দের মধ্যেও সে সেই রকম তলিয়ে গেল। চার্চে অপরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার প্রথমার গলা যেমন মিলে যেত, এই শব্দও তার কাছে সেই রকম ঠেকলো, উচ্ছ্বাসে তার চোখ দুটী জলে ভরে গেল। টোবি লাইনের ধারে ফুল সংগ্রহ করছিল। পিতৃসুলভ আনন্দে থিয়েল শিশুর এই খেলা উপভোগ করতে লাগলো। গাছের ওপর একটা বাদামী রঙের কাঠবেড়ালীকে দেখিয়ে টোবি জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, এই কি সেই সুন্দর প্রভু (ঈশ্বর), যার কথা তুমি আমায় মাঝে মাঝে বল।" থিয়েল উত্তরে বললো,—বোকা ছেলে কোথাকার, কি বলে যে তার ঠিক নেই।

থিয়েল ও টোবিয়াস যখন ফিরে এল, তখন লেনা প্রায় অর্দ্ধেক জমি পরিষ্কার করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে দু'একখানা ট্রেণ ছন্দিত গতিতে লাইন ধরে যাচ্ছিল, আর টোবিয়াস মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেগুলি নিরীক্ষণ করছিল, এমন কি, তার সৎমাও তার এই আনন্দে অংশগ্রহণ করছিল।

তারা ঘরের মধ্যেই তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে নিল। আহারের পূর্ব্বেই লেনা তাদের জমি পরিষ্কার করে ফেলেছিল, এখন খাওয়া শেষ করে সে জমিতে আলুর বীজ বপন করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হোল। ছোট শিশুটীর প্রতি দৃষ্টি রাখবার জন্য টোবিকেও সে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি স্বামীর কাছে চায়। প্রত্যুত্তরে থিয়েল তার অনুমতি জানিয়ে লেনাকে বলে, সে যেন লক্ষ্য রাখে টোবিয়াস যাতে লাইনের উপর না যায়। লেনা সম্মতি জানায়।

... সাইলেসিয়ান এক্সপ্রেস্ আসার সঙ্কেতধ্বনি বেজে ওঠে। গেটের সামনে প্রস্তুত হয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই থিয়েল নিকটবর্ত্তী ট্রেণের আওয়াজ শুনতে পায়। মুহূর্ত্তের মধ্যে ট্রেণ কাছে এসে যায়। ইঞ্জিনের কালো চোঙার মধ্য থেকে অসংখ্য ধোঁয়ার রাশি নির্গত হচ্ছিল; ইঞ্জিন থেকে পরপর তিনটী সঙ্কেতসূচক বংশীধ্বনি হোল। থিয়েলের কেমন যেন মনে হোল যে ট্রেণটা নিশ্চয়ই থেমেছে। থামার কারণ অনুমান করতে না পেরে থিয়েল গেট পেরিয়ে লাইনের ধারে গিয়ে বাক্স থেকে লাল ঝাণ্ডা বার করে ট্রেণের সামনে মেলে ধরে। তার মনে হোল লাইনের মধ্যে কি যেন একটা পড়েছে। সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলো, "ট্রেণ থামাও, ট্রেন থামাও"। কিন্তু হায়, বৃথাই তার চীৎকার করা! কি যেন একটা গোলাকার কালো বস্তু ট্রেণের মাঝখানে ঢুকে চাকার সঙ্গে রবারের মত জড়িয়ে গেছে। এর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ব্রেক কসার আওয়াজ হয়। এক নিমেষেই এই নির্জ্জন স্থানটী কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে। ট্রেণ চালক ও ব্রেক রক্ষক লাইনের পাশের রাস্তা ধরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যায়। ট্রেণের প্রত্যেক জানালা দিয়ে যাত্রীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয়। ট্রেণের পিছনে ভীড় জমে গেল, ক্রমশঃ তারা দল বেঁধে সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

দুর্ঘটনার স্থান থেকে একটা গুমরানো আওয়াজ ভেসে আসছিল—একটা পশুর ক্রন্দন বলেই মনে হোল। এ কি, লেনার কণ্ঠস্বর, না! আবার সে ভাবলো,—না, তা হতে পারে না।

একটী লোক লাইনের পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে এসে বললো—ঝাণ্ডাওযালা, ব্যাপার কি, বল তো? থিয়েল উত্তরে জানালো, একটা দুর্ঘটনা; মানুষটা এখনও হয়ত বেঁচে আছে, চেষ্টা করলে এখনও বাঁচান

যেতে পারে। লোকটী বললো,—তাড়াতাড়ি ছুটে এস। থিয়েল লোকটীকে অনুসরণ করলো।

গাড়ীর জানালা থেকে ভয়ার্ত্ত শুষ্ক মুখগুলি উঁকি ঝুঁকি মারছিল। একটী নব বিবাহিত দম্পতি জানালা দিযে মুখ বাড়িয়ে ছিল; তারা বিবাহের পর মধুচন্দ্র যাপন করতে চলেছে। এই দুর্ঘটনা ও কলরব তাদের মনে একটুও রেখাপাত করতে পারলো না; তাদের এতে কি এসে যায়? নিয়তির কি পরিহাস, কেউ ঘর বাঁধতে যায়, আবার কারুর ঘর ক্রমশঃ ভাঙ্গতে সুরু করে!

লেনার গভীর আর্ত্তনাদে থিয়েলের কাণ ভরে যায়। তার দৃষ্টি ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে; সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। লাইনের মধ্য থেকে একটা শিশুর ফ্যাকাশে রক্তাক্ত দেহ দেখতে পাওয়া গেল, তার কপালটা আঘাত লেগে কালো হয়ে গিয়েছে, ওষ্ঠদ্বয় নীল হয়ে গেছে বাছার, আর তার থেকে অঝোরে রক্ত ঝরে পড়ছে।

থিযেলের মুখ থেকে একটা কথাও বেরুলো না; তার মুখ কঠিন ও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর সে নতজানু হয়ে কঠিন দেহটী তুলে নিযে রেলওয়ে ডাক্তারকে ছুটে গিয়ে ডেকে আনবে স্থির করলো। গার্ড ও গাড়ীর অন্যান্য সকলে বলে ওঠে, তারাই শিশুকে বহন করে নিয়ে যাবে, ঝাণ্ডাওয়ালার কোন চিন্তা নেই। কিন্তু বৃথাই তাদের অনুরোধ করা, থিয়েলের সামনে থেকে কেউ শিশুকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না। গার্ড গাড়ী থেকে একটা ষ্ট্রেচার বার করে তার দু'একজন সহকর্ম্মীদের শিশুর পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করে। সময়ের মূল্য আছে; গাড়ীর বাঁশী বেজে ওঠে। গাড়ীর জানালা থেকে অজস্র টাকা পয়সার বর্ষণ হতে থাকে। লেনা পাগলিনীর মত

আর্ত্তনাদ করে ওঠে। গাড়ীর সকলে সমস্বরে বলে উঠলো,—"হায় অভাগিনী নারী, অভাগিনী মা, কি দোষে তোর এমন দশা হলো।" গার্ড কয়েকবার বাঁশী বাজিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই শাদা ধোঁয়ার রাশি উদ্গীরণ করতে করতে ট্রেণটী তীব্র গতির সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বনপথ দিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

এতক্ষণে ঝাণ্ডাওয়ালার যেন একটু জ্ঞান ফিরে আসে। সে অর্দ্ধমৃত শিশুটীকে ষ্ট্রেচারে শুইয়ে দিল। বাছার ছোট দেহটী একেবারে পিষে গিয়েছে। খোকার গলা থেকে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল; তার হাত পায়ের গ্রন্থিগুলি একেবারে শিথিল হয়ে গিয়েছিল আর পায়ের গোড়ালি দুটী মুড়ে উল্টোদিকে ঘুরে গিয়েছে। থিয়েল এ দৃশ্য আরে সহ্য করতে পারলো না। চারিদিক নিঃস্তব্ধতায় ভরে যায়। শুধু দুটী লোকে পরামর্শ করলো যে শিশুকে ফ্রায়েড্রিক্‌সাগেনে নিয়ে যেতে হলে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তাদের হেঁটে যেতে হবে। কারণ মেল্‌টা এখানে থামে না। থিয়েল চিন্তা করলো, তাদের অনুগমন করবে কিনা। ঝাণ্ডাওয়ালার কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে লোক দুটীর কোন ধারণাই ছিল না। থিয়েল ইসারা করে তার স্ত্রীকে ষ্ট্রেচারটী ধরতে আজ্ঞা করলো। লেনা তাকে অবজ্ঞা করতে পারলো না।

থিয়েল টোবির বহনকারীদের সঙ্গে কর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে, সেখান থেকে উদাস দৃষ্টিতে তাদের গতি লক্ষ্য করতে লাগলো। হঠাৎ উত্তেজনার বশে হাত দুটী দিয়ে কপাল চাপড়াতে থাকে; যা কিছু দেখল সবই হয়তো গত রাত্রের মত স্বপ্ন। টলতে টলতে কোন রকমে সে তার নির্দ্দিষ্ট ঘরটীতে যেতে না যেতেই উপুড় হ'য়ে পড়ে গেল। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল তার টোবীর রক্তাক্ত দেহকে গাড়ীতে তোলা হচ্ছে। বাছারে!

থিয়েলের জ্ঞান ফিরে আসতেই সে অনুভব করে যে গেটের কাছে রৌদ্রতপ্ত স্থানেই সে পড়ে আছে। তার মাথা এবারে যেন বেশ একটু পরিষ্কার হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গেই বোধশক্তিও ফিরে আসে। ঘড়িটা তুলে নিয়ে সে দু'ঘণ্টা ধরে মুহূর্ত্তের কাঁটাটার প্রতি লক্ষ্য করে সে ভাবে, এতক্ষণে হয়ত লেনা টোবিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে পৌছেচে; ডাক্তার পরীক্ষা করে যেন বলছেন,—সব শেষ, বড়ই দুর্ভাগ্য।

ঝাণ্ডাওয়ালা আপন মনে চীৎকার করে বলে ওঠে, "তা'হলে সত্যিই কি সব শেষ হয়ে গেল, আর কি তাকে ফিরে পাব না?" তারপর দাঁড়িয়ে উঠে আকাশের দিকে হাত মেলে দিয়ে চীৎকার করে বলতে থাকে,—না, তার বাঁচা চাই; তাকে বাঁচতেই হবে, তাকে বাঁচতেই হবে। এই করুণ চীৎকার গগন বিদীর্ণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে সে দেখলো অস্তাচলের রক্তরাগে সারা আকাশ যেন রঙিয়ে গেছে। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সে থমকে দাঁড়ায়; তারপর দুই বাহু প্রসারিত ক'রে লাইনের মাঝখান দিয়ে চলতে সুরু করে দেয়; মনে হোল, কি যেন সে ধরতে চলেছে। ক্রমশঃ তার দৃষ্টিশক্তি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে; কাকে যেন উদ্দেশ করে সে বলে ওঠে, "পালিয়ে যেও না, যেও না; শোন; থামো, থামো; তাকে আমায় ফিরিয়ে দাও। বাছা আমার আঘাত পেয়ে কালো আর নীল হয়ে গেছে। মিন্না, আমি তোমার কাছে শপথ করছি, তাকে মেরে শেষ করে ফেলবো।" ছোট শিশুর মত সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মিন্না, মিন্না' বলে; আবার সে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "লেনাকে আমি মেরে ওই খোকার মতই কালো আর নীল বানিয়ে দেবো; এই কুড়ুল দিয়ে আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো, তবে আমার শান্তি

আসবে মনে।” তার মুখ থেকে ফেনা কাটতে থাকে, চোখ দুটী কাঁচের মত স্থির হয়ে আসে।

একটা মৃদুমন্দ সমীরণে বনানী আলোড়িত হয়ে উঠলো; ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। পশ্চিম আকাশের গায় কয়েক খণ্ড গোলাপী রংয়ের মেঘের আবির্ভাব হোল। থিয়েল ঘুরে দাঁড়িয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ অনুসরণ করে আবার চলতে আরম্ভ করে দিলো। বৃক্ষশাখার ওপর থেকে সূর্য্যের শেষ লাল আভাসটুকু মিলিয়ে গেল। দূরে শুধু একটা কাঠুরিয়ার কুঠারের আঘাতে বনের নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ হতে থাকে। ঝাণ্ডাওয়ালার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা উন্মাদনার ভাব তাকে পেয়ে বসে। শিশুটীর ক্রন্দনধ্বনি যেন এখনও তার কানে বাজছিল। এইটাই তার উন্মাদনার প্রথম লক্ষণ।

তার মনে হতে লাগলো, লেনাই তার শিশুর মৃত্যুর কারণ; আবার দাঁত চিবিয়ে চীৎকার করে বলে ওঠে, “সৎমা, পিশাচিনী কোথাকার।” এর কিছু পরেই তার মনে হয়, শিশুটি যেন বেঁচেই রয়েছে, মরেনি। বাতাসে আলোড়িত হয়ে দূরে একরাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলী এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে থাকে; ইঞ্জিনের ধ্বনিটা তার কাছে একটা নির্য্যাতিত দৈত্যের আর্ত্তনাদের মত ঠেকলো। আকাশের গা থেকে আস্তে আস্তে ধোঁযাগুলি সরে যেতে থিয়েলের বুঝতে দেরী হল না যে দিবা অবসানে লাইনের কুলীরা খালি মালগাড়ীতে করে ঘরের দিকে ফিরছে। কিছু দূরে ব্রেক্ কসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে পড়ে। যাত্রীরা সবাই নির্ব্বাক হয়ে ঝাণ্ডাওয়ালাকে দেখে ফিস্ ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল। গার্ড গাড়ী থেকে নেমে থিয়েলের সঙ্গে করমর্দ্দন কোরল। হায়, সে

আর এ জগতে নেই! লেনাও শিশুর সঙ্গে নেমে পড়লো, শোকে তার চোখে কালো রেখা ফুটে উঠেছিল।

লেনা তার স্বামীর চেহারা দেখে চমকে উঠে লক্ষ্য করে, থিয়েলের গাল দুটী ভয়ানকভাবে বসে গিয়েছে, আর একদিনেই যেন চুলগুলি সব সাদা হয়ে গিয়েছে; সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি থেকে একটা উন্মাদনার আভাস ফুটে বেরুচ্ছে।

মৃতদেহটী বহন করার জন্য ষ্ট্রেচার আনা হোল। চারিদিক নিস্তব্ধ। থিয়েল যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সচকিত হরিণগুলি উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে লাইনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ইঞ্জিনের বাঁশী বাজতেই তারা বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালালো।

ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই থিয়েল জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শিশুটীর মৃতদেহ ঘরের মধ্যে রেখে থিয়েলকে তারা ষ্ট্রেচারে বহন করে নিয়ে যায়। তাকে অনুসরণ করার সময় লেনার গণ্ডদ্বয় দিয়ে অবিরাম অশ্রুধারা ঝরে পড়তে থাকে। গ্রামের কাছে এসে পৌঁছতেই দুঃসংবাদ পেয়ে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। অতি কষ্টে থিয়েলকে সরু সিঁড়ির ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হোল।

অন্য লোকেরা টোবির দেহকে বহন করে আনবার জন্য কুটীর অভিমুখে গমন করলো। প্রবীণদের কথামত লেনা থিয়েলের শরীরে সেঁক দিতে থাকে। সারাদিনের পরিশ্রমে তার শরীর ক্লান্ত হয়ে আসে। ছোট শিশুটীর চোখও ঘুমে বুজে যায়। মূর্চ্ছিত থিয়েলের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

চন্দ্রমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, ঘরটীও আঁধারে ভরে যায়। শুধু স্বামীর ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ

লেনার কাণে এসে বাজছিল। সে ভাবলো, একটা মোমবাতি জ্বালাবে কিনা ; এমন সময় সে অনুভব করে, সাঁড়াশীর মত দুটো হাত সজোরে তার গলা চেপে ধরছে ; আস্তে আস্তে লেনার চোখের তারা দুটী বুজে আসে।

কিছু পরে গ্রামবাসীরা টোবির দেহ বহন করে নিয়ে এলো ; থিয়েলের শোবার ঘরের দরজা খোলা দেখে তারা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠে লেনার নাম ধরে ডাকতে লাগলো। একজন দেশলাইএর কাঠী জ্বেলে যা আবিষ্কার করলো তা অত্যন্ত ভয়াবহ। লেনার সারা দেহ রক্তাক্ত, তার মাথার খুলিটা ভেঙ্গে দুফাঁক হয়ে গিয়েছে। সকলেই আতঙ্কে সমস্বরে বলে ওঠে, "খুন! খুন! থিয়েল তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে!" আরও তাদের দৃষ্টি পড়লো ছোট শিশুটীর প্রতি, তার গলাও কাটা।

ঝাণ্ডাওয়ালাকে দেখা গেল না, সে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে ; সেই রাত্রে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পরদিন প্রাতে তাকে দেখা গেল সেই দুর্ঘটনার স্থানে। আগ্রহের সঙ্গে টোবির বাদামী রঙের টুপীটা নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছে। টোবির স্মৃতি তার মর্ম্মে মর্ম্মে গেথে গেছে।

অনেক চেষ্টা করে সকলে মিলে তাকে লাইন থেকে তুলে আনলো। আনবার সময় বলপ্রয়োগ পর্য্যন্ত করতে হয়েছিল তাদের। তার হাত পা না বেঁধে উপায় ছিল না, দু'চারজন পুলিশের হেপাজতে দিয়ে তাঁকে বার্লিনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে জেলে পরীক্ষা করে ডাক্তার তাকে দাতব্য মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন।

এখনও টুপীটা সে হাতছাড়া করেনি। পিতৃসুলভ স্নেহে মাঝে মাঝে যেমনভাবে টোবিকে আদর করতো, আজও পর্য্যন্ত সে টুপীটিকে সেই রকম ভাবেই নাড়াচাড়া করে থাকে।

লিউকারৃডিস্

ঠিক রুশ বিদ্রোহের সময় মস্কো নগরীর রাজপথে একদিন একটা কোলাহলের সৃষ্টি হয়। জনতার উত্তেজনার কারণটা এই রকম,—ছত্রিশটী ছাত্র ছাত্রী তাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের জয়ন্তী উৎসব নিয়ে মাতে। পুলিশ শিক্ষকটীকে খুব সন্দেহের চোখে দেখতো। এই নির্ব্বাসন দণ্ডের আরও একটা কারণ হোল তারা এই জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য ক'রে কয়েকটী গুপ্ত অধিবেশনে যোগ দেয়। এতে মস্কো সহরের কয়েকটী সম্ভ্রান্ত বংশীয় পরিবার মর্ম্মাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নির্ব্বাসিতদের মধ্যে এন্না প্যাভ্‌-লোভ্‌না নামে একটী মেয়েও ছিল; ইভ্‌জেন নামে তার এক ভাই মস্কোতে বাস কোরত।

ইভ্‌জেন একটা সৈন্যদলের কর্ম্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিল; তার বয়স ছিল মাত্র তেইশ। সকলেরই ধারণা ছিল, এই গর্ব্বিত সুন্দর যুবকটীর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। ইভ্‌জেন তার বোনকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসত, তার জীবনে সেই ছিল একমাত্র বান্ধবী। চিরদিনের মত তাকে সে হারাবে এই বিচ্ছেদ বেদনায় তার মন জর্জ্জরিত হয়ে উঠলো। এই অবিচারের প্রতিবাদ সে কোরবেই স্থির কোরল।

পুলিশের এই কঠোর ব্যবস্থার কয়েকদিন পরেই তার অধীনস্থ সৈন্য-দলকে একটা উত্তেজিত জনতাকে দমন করবার আদেশ দেওয়া হয়। হঠাৎ ইভ্‌জেন তার দলের মধ্য হতে ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে পোড়ে, যেখানে ভাঙ্গা পাথর, গাড়ীর চাকা, বাক্স আর আসবাবপত্র দিয়ে আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য বেড়া দেওয়া হয়েছিল, সেইদিকে ছুটে

গেল। ইভ্‌জেন তার দেশের প্রকৃত শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করার মানসে যেই বেড়াটীর ওপর উঠেছে, এমন সময় তারই অধীনে চালিত সৈন্যদের বন্দুক থেকে দুটী গুলি ছুটে এসে, তাকে বিদ্ধ কোরতেই সে ধরাশায়ী হোল। উত্তেজিত জনতা, তার দিকে হস্ত প্রসারিত ক'রে তাকে বীরত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে অভিনন্দন জানালো; কেউ কেউ তার নাম ধরে ডাকছিল; মনে হোল, এই বিদ্রোহীদের কাছে হয়তো সে খুব পরিচিত। সে খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু জনতার অভিনন্দন তার কাণে এসে পৌঁছতে যন্ত্রণার যেন অনেকটা উপশম হোল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে রিভলবার থেকে আততায়ীদের ওপর অগ্নি বর্ষণ কোরল; তারই সৈন্যদলের কয়েক-জন ছুটে এসে তার হাত ধরে ফেললো; ধস্তাধস্তি চলেছে এমন সময় দুটী যুবক এসে তাকে সৈন্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। একটু পরেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

ইভ্‌জেনের অসাড় দেহকে বহন করে এনে একটা প্রস্তরখণ্ডের ওপর তারা শুইয়ে দেয়। অবিলম্বেই তার কোটটা খুলে ফেলে, আস্তে আস্তে রক্তাক্ত স্থানটী ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জড়িয়ে ফেললো। সামনেই একটা ফিরি-ওয়ালার গাড়ী পড়েছিল। গাড়ীর মালিকটী কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে; ঘোড়া দুটীও প্রচণ্ড শীতে যেন জমে গিয়েছে। অবিলম্বেই তারা কর্ম্মচারীটীকে সেই সব্‌জীর গাড়ীর মধ্যে শুইয়ে, পাতা দিয়ে তার সারা অঙ্গ আচ্ছাদন করে দিল। তাদের মধ্যে একজন বেড়াটীর দিকে চলে গেল, অপরজন বহু রাস্তা অতিক্রম করে একটী গলির মধ্য দিয়ে ইউনিভার্সিটীর হাঁসপাতালের সামনে এসে পৌঁছল। হাঁসপাতালের প্রাঙ্গনে নেমে সে একজন সহকারী ডাক্তারের কাছে বিষয়টা ব্যক্ত কোরল। ডাক্তার ইভ্‌জেনকে একটা ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করে নিলেন। গুরুতর ভাবেই সে আহত হয়েছিল। তৃতীয় দিনে তার জ্ঞান ফিরে আসে। আস্তে

আস্তে সে তার অবস্থা উপলব্ধি করে, আর বুঝতে পারে, কোথায় সে এসেছে।

ইতিমধ্যে সারা মস্কো সহরে সেই যুবক সামরিক কর্ম্মচারীর পলায়ন নিয়ে আলোচনা হোতে থাকে। অচিরেই পুলিশ, গোয়েন্দার সাহায্যে ইভ্‌জেনের হদিস বার করে ফেললো। একজন গোয়েন্দা পুলিশ অর্দ্ধমৃত লোকটীকে ধরবার জন্য হাঁসপাতালে ঢুকে বুঝতে পারে যে রোগীর অবস্থা খুবই শোচনীয়, কিন্তু তথাপি সে শমন বার করে যুবকটীকে গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা জানায়। সহকারী ডাক্তারের সঙ্গে এই নিয়ে তার তুমুল তর্ক চলেছে এমন সময় ডাক্তার বেরিয়ে এসে যুবকটীর অসহায় মুখের প্রতি তাকিয়ে করুণায় আর্দ্র হোয়ে গেলেন। তিনি মিনতির সুরে বোললেন, "ওকে এখন সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই বৃথা; পথের মধ্যেই হয়তো ওর মৃত্যু হতে পারে।" কিছুক্ষণ চিন্তার পর পুলিশ কর্ম্মচারীটি ঠিক কোরল যে রোগী আরোগ্যলাভ কোরলেই তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে। এইভাবে কিছুদিনের জন্য ইভ্‌জেন গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

ডাক্তারের রোগীটির প্রতি সহানুভূতির মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগলো,সকলেই যাতে রোগীর প্রতি যত্ন নেয় এ ব্যবস্থাও তিনি কোরলেন। বন্ধুরা ইভ্‌জেনের পলায়ন পথে সাহায্য করার মানসে এগিয়ে এলো। একদিন প্রভাতে তাকে একটি গুপ্ত কক্ষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হোল। সেইদিনই সায়াহ্নে ছদ্মবেশে যাতে ইভ্‌জেনকে সোকল্‌নিকিনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই উদ্দেশে একটী যুবক আরদালির পোষাক সমেত এসে হাজির হলো। ইভজেনও তাকে অনুসরণ কোরতে মনস্থ কোরল। যদি সে এখানে আর বেশী দিন থাকে, তা'হলে হয় তার ফাঁসি হবে, নতুবা তুষারমণ্ডিত সাইবেরিয়ার নির্জ্জন প্রান্তরে তাকে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করতে হবে।

গভীর রাত্রে তুষার পতনের মধ্য দিয়েই পলাতককে সোকল্‌নিকিনে নিয়ে গিয়ে এক বৈজ্ঞানিকের কুটীরে থাকার ব্যবস্থা করা হোল। চব্বিশ ঘণ্টা না পেরুতেই বার্ত্তাবহনকারীরা এসে জানিয়ে দিল যে সেই রাত্রেই ইভ্‌জেনকে অতর্কিতভাবে গ্রেপ্তার করার মানসে পুলিসের একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য সে অস্থির হয়ে উঠলো। বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক জাতিতে ছিলেন জার্ম্মান; তিনি তাঁর প্রিয় ভগ্নীর সঙ্গে একত্র বাস কোরতেন। ভগ্নী এনেস্‌থেসিয়া যেমন ছিলেন সাহসী তেমনই ছিল তাঁর হৃদয়ের মধ্যে করুণার প্রস্রবণ। মস্কো নগরীতে চল্লিশ বছর ধরে বাস করার জন্য মহিলাটীর সহিত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সখ্যতা জন্মেছিল; সাধারণ লোকেও তাঁকে কম স্নেহ কোরত না। বৈজ্ঞানিকের ঘরের সব কিছুই এই মহিলাটীকে দেখতে গোত। এ ছাড়া এনেস্‌থেসিয়া রোগীটিকে সেবা যত্নও কোরতে লাগলেন।

তরুণ কর্ম্মচারীর অবস্থান সম্বন্ধে যাতে সকলেই অজ্ঞাত থাকে এদিকেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। ইভ্‌জেনের বেশভূষা একেবারে বদলে দেওয়া দরকার এই ভেবে মহিলাটী তাকে মজদুরের বেশে আচ্ছাদিত করে সহরতলীর একটা কাঠুরিয়ার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ইভ্‌জেন সেখানে এক রাত্রির বেশী আশ্রয় পেল না, কারণ কাঠুরিয়া নিজে এবং তার পরিবার পলাতককে আশ্রয়দানের জন্য বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে পারে না। এইভাবে কোনদিন বা সহিসের ঘরে ইভ্‌জেন আশ্রয় নেয়, আবার অন্যদিন ল্যাবরেটরীর এক কর্ম্মচারীর ঘরে রাত কাটিয়ে দেয়; কেউই ভয়ে তাকে একদিনের বেশী আশ্রয় দিতে সাহস করে না; মহিলাটীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও তারা পুলিশের ভয়ে তাকে আর বেশীদিন আশ্রয় দিতে পারলো না। ইভ্‌জেনের অবস্থা দেখে তার ক্ষতস্থানগুলিকে নিয়মিতভাবে পরিষ্কার ক'রে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবার জন্য এনেস্‌থেসিয়াকে সেই রাত্রে

ইভ্‌জেনের কাছে থাকতেই হোল। বিশ্রামের অভাবে ঘাগুলোও তার এখনও সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায়নি। ল্যাবরেটারীর কর্ম্মচারীটি ইভ্‌জেনকে আর অধিক সময় থাকতে দিতে রাজী হোল না। মহিলাটী হতাশ হোয়ে ভাবলেন, কি করা যায়। তাঁর বন্ধু ও বান্ধবীরা বিদ্রোহীর জন্য আর বিশেষ কিছু ব্যবস্থা কোরতে সাহস কোরল না ; তারা বুঝতে পারলো প্রতি পদেই পুলিশ তাদের অনুসরণ করছে, একবার ধরা পড়লেই সর্ব্বনাশ। আর একবার তরুণীটি করযোড়ে ল্যাবরেটারীর কর্ম্মচারীর কাছে শুধু এক রাত্রির জন্য আশ্রয় ভিক্ষা চাইলেন। অনেক অনুরোধে শুধু তিন ঘণ্টার জন্য আশ্রয় মিললো।

ঘড়িতে তিনটা বাজলো, আর তিন ঘণ্টা মাত্র হাতে সময় ; ছ'টার মধ্যেই তাকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আশ্রয়ের অনুসন্ধানে মহিলাটী এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে অনেক চেষ্টা কোরলেন, কিন্তু আশ্রয় কোথাও মিললনা। দুশ্চিন্তায় নারীটির মন ভরে গেছে, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হোল যে প্রেমিক প্রেমিকাদের নিশি যাপনের জন্য এক ধরণের ঘর তো ভাড়া পাওয়া যায় ; এই রকম স্থানে পাসপোর্ট-হীন ব্যক্তিও তো আশ্রয় পেতে পারে। দুদিন বিশ্রাম লাভ কোরলেই কর্ম্মচারীটি অনেকটা সুস্থ হয়ে নিজেই নির্ভয়ে সীমান্ত অতিক্রম কোরে যেতে পারবে। এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত কোরতে হোলে এমন একটী তরুণীর প্রয়োজন যে হবে খুব বুদ্ধিমতী, সাহসী এবং প্রেমের অভিনয়ে দক্ষ। এনেস্‌থেসিয়া এমন একটী নারীর কথা মনে কোরতে পারলেন না, যার দ্বারা এ কাজ সম্ভব হতে পারে। বিদ্রোহীদের সঙ্গেও তাঁর সে রকম পরিচয় ছিল না, যাও বা দু'একজনের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাদের এ কাজের ভার দিতে তাঁর সাহস হোল না, কারণ পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি থেকে তাদের রেহাই পাওয়া মুস্কিল। এমন একটী সম্ভ্রান্ত ঘরের

সুন্দরী কিশোরীর প্রয়োজন, যার প্রতি পুলিসের একটুও সন্দেহের উদ্রেক হোতে না পারে।

এইভাবে চিন্তা কোরতে কোরতে ও ক্ষুধা নিবৃত্তির আশায় এনেস্থেসিয়া একটি রেস্তোরাঁতে ঢুকে পোড়লেন। ঘরের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি পোড়ল ছুটি নারীর প্রতি; তারা সামনা-সামনি বসে তরল চকোলেট পান করছে। অন্যদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে একটা চেয়ার টেনে তিনি বসে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পোড়ল উপবিষ্টা নারীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা নারীটির প্রতি, তিনি যেন হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এনেস্থেসিয়ার আর বুঝতে বিলম্ব হোল না যে সেই নারীটি হোলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষের বধির ও বাক্‌হীন স্ত্রী; তাঁর পাশে লিউকার্ডিস্ নামে উনিশ বছরের পরমা সুন্দরী মেয়েটা বসেছিল। লিউকার্ডিসের ওপর চোখ পোড়তেই এনেস্থেসিয়ার মনে হোল যে তাঁর কল্পিত কাজটা এর দ্বারাই শুধু সম্ভব হোতে পারে। কয়েক বৎসর আগে তিনি মধ্যে মধ্যে এই সৈন্যাধ্যক্ষের বাড়ীতে এসে অতিথি হোতেন; তখন লিউকার্ডিস্ ছিল কয়েক বৎসরের মাত্র বালিকা। কিশোরীটির মা ছিলেন খুব সরল, ধার্ম্মিক ও সাহসী।

এনেস্থেসিয়া তাঁদের পাশে বসে ইঙ্গিতে কুশল সমাচার জেনে নিলেন। এরপর খুব আস্তে আস্তে লিউকার্ডিসের সঙ্গে কথাবর্ত্তা চলতে লাগলো। সৈন্যাধ্যক্ষের স্ত্রী তাঁদের মুখের দিকে চেয়েছিলেন; পাছে এই অকারণ দৃষ্টিপাতকে মহিলাটী অশিষ্ট আচরণ বোলে মনে করেন, এই ভেবে তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। এনেস্থেসিয়া মাঝে মাঝে উত্তেজিত হোয়ে উঠছিলেন; কেবলই তাঁর মনে হচ্ছিল, এই অভিসন্ধি কি ভাবে পূর্ণ হতে পারে; আর বিলম্ব করার সময় নেই; সংক্ষেপে এই অভিসন্ধিটা এমন ভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে, যাতে লিউকার্ডিসের

অন্তরের মধ্যে যুবকটীর জন্য সহানুভূতির উৎস জেগে ওঠে। কলার কৌশলে যদি ভ্রান্তি এসে যায় তা'হলে সমস্ত বিষয়টা পণ্ড হয়ে যাবে।

বিদ্রোহের বিচিত্রগতির সম্বন্ধে লিউকার্‌ডিসের কোন ধারণাই ছিলনা। কিশোরী স্বপ্নরাজ্যে বাস করে; ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সে ডুবে আছে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে এমন একটা তেজস্বীতার ভাব রয়েছে যা সব সময় তার বাইরের আচরণে প্রকাশ পায় না; প্রয়োজন হোলে সে যে কোন রকম দুঃসাহসিকতার কাজে হাত দিতে পারে; সময় সময় তার অন্তরে একটা অস্বস্তির ঝড় বয়ে যায; তা থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়; মনে হয় তার কুটীরের বাইরে যা কিছু, সবই যেন অসুন্দর ও নোংরামীতে ভরা; এই প্রতিকুল আবহাওয়ার মধ্যে যেন তার প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে।

স্থির হয়ে সে এনেস্‌থেসিয়ার কথাগুলি শুনে গেল; ঈষৎ চঞ্চলতার আভাস, বা মোহ, উত্তেজনা অথবা অপবিত্রতার ভাব কিছু তার মনের মধ্যে এলোনা। এনেস্‌থেসিয়ার মুখ দেখে সে বুঝতে পারলো যে কর্ত্তব্যের প্রেরণায় মন তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সহসা লিউকার্‌ডিস্‌ কোন মতামত প্রকাশ করতে পারল না, শুধু কি ভাবে তাকে কাজ করে যেতে হবে সেই উপায়গুলিই ভাল করে বুঝে নিল।

ছয় সপ্তাহ হ'ল পিটার্‌সবার্গ সহরের একটী সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহের কথা পাকাপাকি হ'য়ে গিয়েছে; আত্মীয়-স্বজন সকলেই ভাবল যে এই ভদ্রলোকটীর স্ত্রী হোলে সে খুব সুখীই হবে; কিশোরীরও এতে কম আনন্দ হযনি।

এনেস্‌থেসিয়া তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কোন ভয়ের কারণ নেই, তোমার মনকে শান্ত স্থির করে রাখতে পার।" লিউকার্‌ডিস্‌ মাথা নেড়ে জানালো,—এ প্রতিশ্রুতির

কোন প্রয়োজনই নেই ; ভাবী স্বামী কল্পনাও করতে পারেন না, আমার দ্বারা কোন কুৎসিত ও অসুন্দর কাজ হতে পারে।”

এনেস্‌থেসিয়া—তা’ হলে অভিনয়ের কাজে তোমার মত আছে ?

লিউকায়্‌ডিস্‌—হাঁ, কিন্তু এর মধ্যে একটা অসুবিধাও আছে।

এনেস্‌থেসিয়া গম্ভীর স্বরে এই কথায় বাধা দিয়ে উঠলেন।

লিউকায়্‌ডিস্‌—দু’দিন দু’রাত্রি অনুপস্থিত থাক্‌লে বাড়ীর লোকেরা কি ভাববে বলুন তো ? হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, একটা কাজ করলে তো পারি ; মাকে একটা চিঠি লিখে রেখে সরে পড়লেই হবে।

এনেস্‌থেসিয়া—হ্যাঁ, শুধু কয়েক লাইন লিখলেই হবে, আর তাতে একটু অনুরোধের কথাও থাকবে যে তিনি যেন একথাটা গোপন রাখেন, কারুকে যেন না বলেন। আর একটু পরিষ্কার করে জানিয়ে দেবে, তুমি ফিরে এসে সব কথা তাঁকে খুলে বোলবে। তুমিও কিন্তু এমনভাবে থাকবে যে কেউ যেন না বুঝতে পারে, তুমি কি করে যাচ্ছো।

লিউকায়্‌ডিস্‌ স্থির নেত্রে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়লো। এনেস্‌থেসিয়া একে একে বুঝিয়ে দিলেন, ছদ্মবেশে কি ভাবে তাকে অভিনয় করে যেতে হবে।

আশ্বাস পেয়ে তিনি ইভ্‌জেনের কাছে ফিরে গিয়ে আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করে ফেললেন। ইভ্‌জেন ল্যাবরেটরীর কর্ম্মচারীর ঘরের মধ্যে শুয়েছিল ; মহিলাটীর হাত ধরে সে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলো, “আপনিই আমার জীবনদাত্রী”। এনেস্‌থেসিয়া ধন্যবাদ জানিয়ে তার বেশ পরিবর্ত্তনের কথা উত্থাপন করলেন। ইভ্‌জেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, “বেশ পরিবর্ত্তন করে কি হবে ; আমি একেবারে বদলে গেছি ; দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি সবেরই আমার রূপান্তর হয়েছে ; মনে হচ্ছে চারদিক থেকে কারা আমায় ঘিরে ধরেছে। আমি স্পষ্ট মাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি যেন হারের লকেট

খুলে আমার ছবিটীর দিকে চেয়ে আছেন। আমার অনুভবশক্তি যেন একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ; সারা পৃথিবীটা এখন কৃত্রিম বোলে মনে হয় ; ভালবাসা, আসক্তি সবই যেন লোপ পেয়েছে মন থেকে।"

এনেস্‌থেসিয়ার বুঝতে অসুবিধা হোল না যে তার অন্তরের মধ্যে একটা অস্বস্তির ঝড় বয়ে চলেছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে একটা গাড়ী এসে থামলো। ইভ্‌জেনকে স্নান করানোর পর সুন্দর ক'রে পোষাক পরিয়ে নীচে নামিয়ে আনা হোল। লিউকার্‌ডিস্ গাড়ীতে ভেল্ আচ্ছাদিত মুখে বসেছিল। এনেস্‌থেসিয়া তার হাতে এক প্যাকেট ব্যাণ্ডেজ ও গজ দিয়ে ইভ্‌জেনকে জানালেন যে দ্বিতীয় দিনের প্রত্যুষে তার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করবেন, আর তার বিদেশ গমনের ছাড়পত্র তিনি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে ফেলবেন। কথা শেষ ক'রে গাড়োয়ানকে গন্তব্য স্থান বুঝিয়ে দিয়ে তিনি হাত তুলে বিদায় জানালেন।

গাড়ী চলেছে, লিউকার্‌ডিস্ ও ইভ্‌জেন পাশাপাশি মৌন হয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে রাস্তার আলো গাড়ীর মধ্যে এসে পড়ছে ; কিশোরী আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলো ইভ্‌জেনের চোখ দুটী বোজা, মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। ইভ্‌জেন তার হাতখানি তরুণীর হাতের মধ্যে রাখলো ; এত কাছাকাছি বসেও লিউকার্‌ডিসের মনে উত্তেজনা অথবা ভয় কিছুই এলো না ; এই মৌনতা তার বেশ ভালই লাগছিল।

একটী বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। দুর্ব্বলতার জন্য গাড়ী থেকে উঠে নামতে ইভ্‌জেন বেশ একটু পরিশ্রান্ত বোধ করছিল। দুটী ঘরের জন্য আবেদন করাতে গৃহস্বামী তাদের রীতিমত অভ্যর্থনা করলেন। শরীরটাকে কোন রকমে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে

গেল। ঐশ্বর্য্যবান লোক যেমন তার অবসর সময় আনন্দে ও স্ফুর্ত্তিতে কাটায় তাকে এ রকম ধরণের একটা ভাণ করতে হোল।

প্রথা অনুযায়ী হুকুম তদারকের জন্য একটী চাকর এসে হাজির হোল; বেহারাটীর পোষাক ছিল জমকালো ধরণের। তার শুক্‌নো মুখ থেকে একটা অস্বাভাবিক রকমের হাসি বেরিয়ে আসছে, আর অতি বিনয়ে দেহ নুয়ে পড়েছে। টেবিলটা সাজিয়ে ফেলে সে যেন কুকুরের মত আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। পরিশ্রান্ত ইভ্‌জেন নৈশ ভোজন, হুইস্কি ও শ্যাম্পেন্ আনতে আদেশ কোরল; সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করছিল যে এর পিছনে রয়েছে এক বিরাট অভিনয়।

লিউকার্‌ডিস্ মুখে খানিকটা রং বুলিয়ে ও কোন রকমে সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য একটা ছোট গাউনে দেহকে ঢেকে দিয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার সরল শিশুসুলভ মুখে জোর ক'রে পতিতা নারীদের মত একটা স্ফুর্ত্তির ভাব আনতে হোল। সে বুঝেছিল, এটা অভিনয় মাত্র আর কিছু নয়। অনর্গল কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছিনালীর ভঙ্গীতে তাকে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতেও হচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে ইভ্‌জেনের গলা জড়িয়ে ধ'রে কোলে গিয়ে বসছিল। থেকে থেকে সে কটাক্ষে কামাতুরা বিরহিণীর ভাব ফুটিয়ে তুলছিল। যে সব জিনিষ সে কখন দেখেনি, দেখতেও চায়নি বা ভাবতেও পারেনি সেই সব কাজ বেহারাকে ঠকাবার জন্য তাকে ক'রে যেতে হোল। জ্বল্‌জ্বলে আলোয় ভরা ঘর, রঙীন কুশান ও আয়না পরিবৃত ঘরখানির সঙ্গে সে কোন রকমে খাপ খাইয়ে নিল। এই লজ্জাজনক জমকালো স্থানে তার মনে বিদ্রোহের সঞ্চার হয়; শুধু তাই নয়, তাকে আবার এমনভাবে আচরণ করতে হয়, যাতে কেউ তার ব্যবহারের স্বাভাবিকতার সম্বন্ধে সন্দেহ করতে না পারে। খুব সতর্কতার সঙ্গে তাকে এই অভিনয় ক'রে যেতে হয়। সে সব রকমের আহার ও পানীয়ের

স্বাদ গ্রহণ করে ; আবার ওয়েটার বেরিয়ে যাবার পর তাকে ইভ্‌জেনের পেয়ালা থেকেও মদ নিঃশেষ করে ফেলতে হয়, কারণ অসুস্থ শরীরে মদ্য পানের মত অবস্থা তার ছিল না।

জীবনে এর আগে সে মদ স্পর্শই করেনি। এই অস্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে তার মন অবসাদে ভরে আসে, কিন্তু উপায় কি, স্বেচ্ছায় সে এই আত্মোৎসর্গকে বরণ করে নিয়েছে। ওয়েটার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ে। এই নৈশ বীভৎসতার মাঝে পোড়ে তার শিরা উপশিরার রক্ত চঞ্চল হোয়ে ওঠে ; মুখেও একটা গ্লানিজনক অবসাদের ভাব ফুটে ওঠে। মনে হয়, কতদিনই না সে বাবা, মা'কে ছেড়ে এসেছে। তার অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ইভ্‌জেনেরও মন গভীর দুঃখে ভরে ওঠে।

ইভ্‌জেন মনে মনে তার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করলো, বেহারাটা ঘরে ঢুকতে আবার মুখে অভিনয়ের হাসি টেনে আনলো। টেবিলটা পরিষ্কার করে নিয়ে যাবার পর, শাদা টুপী মাথায় একটা পরিচারিকা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়াল'; তরুণী হোলেও বয়স তার বেশীই দেখাচ্ছিল, এই কৃত্রিম আলো ও অবরুদ্ধ আবহাওযার মধ্যে বাস করে তার অবস্থা এই রকমই দাঁড়িয়েছিল। পরিচারিকা জিজ্ঞাসা কোরল, তাদের সুবিধার জন্য সে কি করতে পারে।

পরিচারিকার দিকে চোখ পোড়তেই লিউকার্‌ডিসের পা কেঁপে উঠলো। সে নিজেই নিজের নগ্ন পা, হাত, গলা ও কাঁধের অবস্থা দেখে লজ্জায় অধীর হোয়ে পড়েছিল। নিজের অজ্ঞাতে এই কঠোর পরীক্ষায় কোন রকমে সে উত্তীর্ণ হোল। পরিচারিকা চলে যেতেই তারা ঘর বন্ধ করে বাঁচলো।

দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। লিউকার্‌ডিস্‌

পীড়িত ইভ্‌জেনের রাত্রির বেশ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করে তার শায়িত দেহটাকে চাদরে আচ্ছাদন করে দেয়। লিউকার্‌ডিস্ মনে মনে ভাবে, এই তো প্রকৃত মানুষ। ভাবী স্বামী আলেক্‌জাণ্ডারের কথা স্মরণ হোতে তার চোখ জলে ভরে আসে। স্থিরচিত্তে সে ইভ্‌জেনের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দেয। স্বপ্নজড়িত চোখে ইভ্‌জেন তার সুন্দর হাতগুলি লক্ষ্য ক'রে যায়। ধন্যবাদ জানাবার সাহস পর্য্যন্ত তার হয় না; কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কোরলে পাছে সে অপমানিত বোধ করে, এই ভয়ে সে কিশোরীর মুখের দিকে তাকাতেও সাহস করে না।

ইভ্‌জেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পোড়ল। লিউকার্‌ডিস্ একটা আরাম কেদারায় স্থির হয়ে বসলো। সে ব্যাগের মধ্যে একটা বই এনেছিল কিন্তু পড়ার মত অবস্থা তার ছিল না। বাপ-মা, বন্ধু-বান্ধবী এই সব চিন্তার রাশি চলচ্চিত্রের মত তার মাথার মধ্য দিয়ে ঘুরে গেল। সে ইভ্‌জেনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও সুন্দর অবযবের প্রতি লক্ষ্য করছিল; ধীরে ধীরে রোগীর চিন্তাও যেন তার মন থেকে সরে যাচ্ছিল। সিঁড়ির ওপরের একটা খস্‌খসানি পাযের শব্দ তার কানে এসে বাজতে থাকে। মাঝে মাঝ নারী ও পুরুষের উচ্ছসিত গলার আওয়াজ নীচের দেওয়ালে এসে ঘা দিচ্ছিল। কাঁচের পেযালার ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজে চারিদিক ভরে ওঠে; গানের সুরের তরঙ্গে বাড়ীটা মুখরিত হতে থাকে। একটু পরেই পিয়ানোর শব্দ থেমে যায়। সহসা ঘরের দেওয়ালের বাম দিক থেকে কিছু একটা ভাঙ্গার শব্দ লিউকার্‌ডিসের কানে এসে বাজতেই সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। বদ্ধ ঘরগুলি থেকে সেণ্টের সুগন্ধ ভেসে আসে, আর পোষাকের খস্‌খসানি আওয়াজের সঙ্গে দরজা বন্ধের শব্দও তারা বেশ শুনতে পায়।

জগৎ যে এই রকম ভীষণ হতে পারে, মানুষের জীবনের স্তর বিভাগ

যে এত হীন হয়, একথা লিউকার্ডিস্ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। অন্ধকারে নারী পুরুষ পরস্পরে আলিঙ্গন করা, আলোয় ভরা ঘরের মধ্যে আয়নার সামনে নানা প্রকারের দেহ ভঙ্গিমা করা, আপত্তিজনক কথার মধ্য দিয়ে কুপ্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করা—এই সব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তার মনের পবিত্র দেউলটী যেন কিছু মাত্রায় কলুষিত হতে আরম্ভ কোরল। এই আবেষ্টনীর লজ্জাকে এড়াবার জন্য সে হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলে ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠলো। কিন্তু ইভ্‌জেন হঠাৎ চোখ মেলে চীৎকার করে উঠতেই লিউকার্ডিস্ চমকে উঠে এক গ্লাস জল নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে তার উত্তপ্ত কপালে এক টুকরো ভিজে কাপড় জড়িয়ে দেয়। তারপর ইভ্‌জেন জেগে উঠে ডাক্তার ও এনেস্‌থেসিয়ার কথা বলতে সুরু করে। সে বললো,--পরের দিন একটু সুস্থ হলেই আমি গন্তব্য স্থানে যেতে পারবো। উত্তরে লিউকার্ডিস্ বলে,—এটা অসম্ভব, এখনও আপনার গায়ে বেশ জ্বর রয়েছে।

পরদিন প্রত্যূষে সাতটার আগে ইভজেনের সঙ্গে এনেস্‌থেসিয়ার সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব—এ কথাও কিশোরীটি জানিয়ে দিল। এই রকম মিষ্টি আলাপের মধ্যে তার অন্তরের মাধুর্য্য ফুটে উঠছিল। আরেকবার পিয়ানোর আওয়াজে সারা বাড়ীটা মুখরিত হয়ে উঠলো; এবারের সঙ্গীতে যেন একটা বীভৎসতার ছোঁয়াচ ছিল। মাঝে মাঝে সুরাপায়ীদের কর্কশ স্বরে চারিদিক বিদীর্ণ হচ্ছিল।

ঘড়ির কাঁটা বারোটার দিকে ঘুরে যায়। তারা দুজনেই ভীতিপূর্ণ নেত্রে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। হলঘরের কোলাহলের শব্দ তাদের কানে এসে বাজে; পরক্ষণেই আবার সব যেন স্থির হয়ে আসে। এই বীভৎস মাদকতাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তাদের শিরা উপশিরাগুলি যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে; কয়েক মিনিটের উত্তেজনায় তারা যেন সাধারণ

শত্রুদের প্রতিরোধ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়; তারা যেন এক ভীষণ ঝড়ের মধ্যে আশ্রয় অন্বেষণে বেরিয়ে বাঁচবার উপায় অনুসন্ধান করছিল; লিউকার্‌ডিস্ নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ইভ্‌জেনও নিজের সত্ত্বা ভুলে যায়। যুবকের অন্তরে শুধু দুঃখিত ও নিপীড়িত লিউকার্‌ডিসের মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে আর তরুণীটী ইভ্‌জেনের ভাগ্য ও তার মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে আপন মনে আলোচনা করতে থাকে। ধীরে ধীরে তার অন্তরের আলোড়ন আবার থেমে আসে আর ক্লান্ত ইভ্‌জেনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে যায়।

ঘরে আলো জ্বলার জন্য তার সে রকম ভাল ঘুম হলো না। পাছে লিউকার্‌ডিসের কষ্ট হয়, এজন্য সে আলো নিভিয়ে দিতে পারলো না। লিউকার্‌ডিস্ যুবকের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম ক'রে আলো নিভিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে একটা মোমবাতি জ্বাললো; তারপর ইভ্‌জেনের ঘর থেকে কার্পেটটা এনে মেঝেয় ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর নিজের ফার্ কোটটা কুণ্ডুলী পাকিয়ে তাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো।

শিলাবৃষ্টির শব্দে জানলাগুলো মাঝে মাঝে ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠছিল। পাশের ঘরে ঘুমন্ত ইভ্‌জেনের নিঃশ্বাসের শব্দ লিউকার্‌ডিস্ যেন স্পষ্ট অনুভব করছিল। তার মনে হচ্ছিল যেন নিজের ভাগ্যের সঙ্গে ইভ্‌জেনও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। তার আবার মনে হচ্ছে, সে যেন এক জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দূরে তাদের গৃহটী নিরীক্ষণ করছে। ঘুম তার এসেও এলো না। ইভ্‌জেন তাকে কতই না সান্ত্বনা দিয়েছে, কিন্তু এসব তার কাছে স্বপ্ন বলেই মনে হয়; স্বপ্নে দেখে সে যেন ইভ্‌জেনকে সেবা করছে। প্রভাতের ঝাপ্‌সা আলোয় সে দেখতে পেল একটা ইঁদুর কার্‌পেটের ওপর দিয়ে বিচরণ করছে; ক্রমশঃ ইঁদুরটা যেন বড় হয়ে একটা বিরাট দৈত্যের আকার ধারণ করেছে। উত্তেজনায়

তার মাথা ঘুরে যায় ; অসহায়ের মত ছুটে গিয়ে ইভ্‌জেনের ঘরে ঢুকে পড়ে। সে দেখতে পায় ইভ্‌জেনের হাত দুটী বিছানা থেকে ঝুলে পড়েছে, আর কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘামও দেখা দিয়েছে, মুখটা তার ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ নিজের প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞায় তার মনটা ভরে উঠলো ; পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যাঁর প্রতি এ রকম মমতার সঙ্গে সে তাকিয়ে থাকতে পারে।

তারা এখানে আসবার পর গৃহস্বামী তাদের অবস্থানের কথা কিছুই জানতে চায়নি। এক রাত্রের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া তাদের রীতি। এনেস্‌থেসিয়ার অভিপ্রায় ছিল যে কৌশলে তারা দু'দিনের জন্য থাকবার ব্যবস্থা করে নেবে।

ইভ্‌জেন অর্দ্ধনিমিলিত চোখে বিছানায় শুয়ে ছিল ; সে নিজেই প্রথম এই স্থানে দ্বিতীয় রাত্রি যাপনের কথা উত্থাপন কোরল। সে আবার ভাবলো, গৃহস্বামীকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা ঘুস্‌ দিলে এ প্রস্তাবে সে রাজী হবেই। সে লিউকার্‌ডিস্‌কে বললো যে পঞ্চাশ রুবলের মত না দিলে হবে না। প্রত্যুত্তরে লিউকার্‌ডিস্‌ জানালো যে এই রকম উদারভাবে খরচ করলে গৃহস্বামীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে এবং তাদের কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য হয়ত রাখবে।

লিউকার্‌ডিসের কৃতজ্ঞতাকে স্মরণ করে ইভ্‌জেনের বিদ্রোহী মন জেগে উঠলো। তার মনে হলো, এ জঘন্য নরক লিউকার্‌ডিসের মত সুন্দরী তরুণীর জন্য নয়, বাহিরের মুক্ত আকাশ ও আলোর মাঝেই তার স্থান। কিশোরীর মধুর ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়ে যায় ; ভাগ্যদোষে ফুলের মত সুন্দর এই কিশোরীকে এই রকম কুৎসিৎ আবহাওয়ার মধ্যে আটাশ ঘণ্টা কাটাতে হয়। পূর্ব্বে তাকে সে দেখেছিল একটা পবিত্র শুভ্রবেশে, ওষ্ঠ দুটীও কি সুন্দর তার মনে হয়েছিল ; কিন্তু এখন যেন তার রূপান্তর

ঘটেছে, সেই অপূর্ব্ব শ্রীও যেন সে হারিয়ে ফেলতে বসেছে। লিউকার্‌ডিসের উপস্থিতিতে তার বিদ্রোহী মনে এখন একটা সত্যিকারের অনুপ্রেরণা জেগে উঠেছে।

তার আবার মনে হয় যে তার এইভাবে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকা একটা লজ্জাস্কর ব্যাপার ; এই কাপুরুষতাই যেন তাকে লিউকার্‌ডিসের কাছে অনেকটা ছোট করে দিয়েছে। এই ভেবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। লিউকার্‌ডিস্‌কে বোঝাতে চেষ্টা করে, তার এ জীবনের কোনই মূল্য নেই ; তার দেশবাসী এর চেয়ে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেছে, অনেক বেশী সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে কারাবরণ করে নিয়েছে। সে আরও বললো, যে সীমান্ত অতিক্রম করে কোন লাভই হবে না, দেশবাসীর সঙ্গলাভ ত হবেই না, তা ছাড়া অসহায় ভগ্নীর সান্নিধ্যও সে পাবে না।

লিউকার্‌ডিস্ তার মনকে সংযত করতে অনুরোধ করে, কিন্তু তাতে অকৃতকার্য্য হয়ে সে আদেশকারিণী সম্রাজ্ঞীর মত ভাব ধারণ করে। হঠাৎ বাইরে কিসের যেন একটা শব্দ সে শুনতে পায় ; পায়ের আওয়াজের মত তার কানে এসে বাজে ; ভয়ে তার আঙ্গুল কামড়ে ফেলে। তার মনে হোল, বাইরে থেকে কেউ যেন তাদের কথাবার্ত্তা শুনছে। আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে পড়ে সে দরজাটা খুলে ইভ্‌জেনের পাশে গিয়ে ব'সে কলিং বেলটা টিপে দেয়। একটু পরেই দরজায় করাঘাত হোতেই তাদের বুঝতে দেরী হোল না যে এ পরিচারিকা ছাড়া আর কেউ নয়।

ইভ্‌জেন দরজা খুলে পরিচারিকাকে প্রাতরাশ ও পানীয় জল আনতে আদেশ কোরল। আজ্ঞামত ঝি ওয়েটারকে সঙ্গে করে জল নিয়ে ঘরে প্রবেশ কোরল। ইভ্‌জেন তাদের পঞ্চাশ রুবলের মত বক্‌শিস্ দিয়ে পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ

কোরল। ওয়েটার মাথা নীচু করে বললো,—আপনারা যা হুকুম করবেন, আমরা তাই পালন করতে প্রস্তুত।

আধঘণ্টা পরে বেহারা চা ও অন্যান্য আহার্য্য নিয়ে ঘরে ঢুকলো। লিউকারডিসের মনে হচ্ছিল, সে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুয়ে আছে। কী যেন একটা বেদনা ও ভয়ে তার শরীর অবসন্ন হয়ে এলো। ইভ্‌জেন স্থির হোয়ে শুয়েছিল ; লিউকারডিসের বেদনা ও দুঃখ অনুভব করে সে অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরল। ওয়েটার টেবিল সাজিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরিচারিকা ঘর থেকে চলে যাবার পর লিউকারডিস্ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলো। তার মনে হোল, যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে সে উঠে আসছে। দরজাটা বন্ধ করে বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিল। কেশদাম খুলে গিয়ে তার উন্মুক্ত বক্ষে লুটিযে পোড়ল। ঘর বাতাসে ভরে যেতে সে আবার জানালা বন্ধ করে, ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ বদলাবার জন্য ইভ্‌জেনের অনুমতি চাইলো। আস্তে আস্তে ক্ষতস্থানটা খুলে ফেলে বুঝতে পারলো যে ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে, আর গায়ে হাত দিয়ে অনুভব কোরল, জ্বরও ছেড়ে গেছে। খুব নিপুণভাবে সে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর লিউকারডিস্ রোগীকে রুটী ও দুধ খেতে দেয় ; ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় সে নিজেও তাড়াতাড়ি কিছু খাবার খেয়ে নেয়। বাড়ীর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে।

ইভ্‌জেন শান্তিতে ঘুমিয়ে পোড়লে লিউকারডিস্ তার ঘরের মধ্যে চলে যায়। চটী জুতো খুলে বিচরণ করার সময় মাঝে মাঝে ঘরের ছবির প্রতি তার দৃষ্টি পড়ছিল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আত্মীয়স্বজন, স্নেহের পাত্রদের কথা তার মনে পড়ে, সে ভাবে, যার আশৈশব কেটেছে এক সৈন্যাধ্যক্ষের ঘরে, তার কিনা আজ এই অবস্থা! আলেক্‌জাণ্ডারের

হাস্তময় মুখখানিও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে; আরও মনে হয়, কোথায় সেই মস্কো সহরের জনতা আর সুন্দর দোকানের সারি, কোথায় সেই যুবক কর্ম্মচারীবৃন্দ ও সুন্দরী রমণীর দল? এ সবের পরিবর্ত্তে সে শুধু দেখতে পাচ্ছে একটা মানুষ আর তার ক্ষতস্থানটীকে—এ শুধু নিয়তিরই পরিহাস। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে ওঠে: ইভ্‌জেনেরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। যুবকটী বেশ জোর গলায় বলে উঠলো,—লিউকার্‌ডিস্, আজ সন্ধ্যায় তুমি ছুটী পাবে, একা থাকবার মত অবস্থা আমার ফিরে এসেছে।

লিউকারডিস্ মাথা নেড়ে বোলল যে তার ক্ষতস্থান যতক্ষণ না শুকিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ সে তাকে ছেড়ে কোন মতে যেতে পারবে না; এ অবস্থায় লিউকার্‌ডিসের সাহায্যের প্রযোজন খুবই রয়েছে। তরুণীটীর মনে হোল যে তার অবর্ত্তমানে যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে সেজন্য সেই দায়ী হবে।

ইভ্‌জেন আগ্রহের সঙ্গে লিউকার্‌ডিসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তার একটু পরে যুবকটী তরুণীর হাতের স্পর্শ পাবার জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়; দুজনের মুখেই কেমন যেন একটা ভীতিজনক ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চমকে উঠে স্পন্দিত হৃদযে লিউকার্‌ডিস্ আয়নার সামনে গিয়ে চুল বেধে নেয়; যুবকটীর আঙ্গুলগুলিও যেন কাঁপতে থাকে, লিউকার্‌ডিস্ আজ্ঞা কোরলেই হয়ত সে এই মুহূর্ত্তেই ঘর থেকে বেরিয়ে পোড়তে পারে, কিন্তু তার মনে হতে লাগলো যে যুদ্ধে সংগ্রাম করে মরাই তার পক্ষে শ্রেয় ছিল। নিপীড়িত কমরেড্‌দের কথা তার মনে এলো; বিদেশে গিয়ে তার উপার্জ্জনের উপায় কি হবে, একথা ভেবেও হতাশায় তার মন ভরে গেল।

লিউকার্‌ডিস্ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজের ক্লান্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বিছানার একধারে গিয়ে বোসল। তরুণীটী শান্ত

স্থির নেত্রে ইভ্জেনের দিকে তাকাল ; তার মুখ থেকে একটা কিশোরী—সুলভ সরলতা পরিস্ফুট হচ্ছিল। ইভ্জেনের মনে হোল এই দুর্দিনে তরুণীটি যেন ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মত এসে তার ভগ্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার করেছে। আনন্দে যুবকের মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ রাত্রি ঘনিয়ে আসে ; অন্ধকারের মধ্যে তারা মৌন হ'য়ে বসে থাকে।

লিউকার্ডিস্ ঘরের আলো জ্বেলে দিল। কোটটা পরিয়ে দেবার জন্য সাহায্য করতে ইভ্জেন তাকে অনুরোধ করে। গতদিনের সন্ধ্যার মতই ওয়েটার নৈশ আহার পরিবেশন করে গেল। ওয়েটারের আচরণে একটা বিশেষ রকমের নম্রতা অনুভব ক'রে তাদের মনে হোল, লোকটি খুব চতুরতার সঙ্গে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। তারা নির্বাক্ হয়ে বসে রইলো, শুধু তাদের হাত দুটী মাঝে মাঝে নড়ে উঠতে লাগলো। এই সন্ধ্যায় লিউকার্ডিসের অভিনয় আগের মত তেমন জমে উঠলো না ; তরুণীটীর হাসি ও আচরণের মধ্যে একটা কৃত্রিমতার ভাব ফুটে উঠছিল। ইভ্জেন তরুণীর কাছে গিয়ে কাণে কাণে বললো যে এখন তাদের একটা ঝগড়ার অভিনয় করে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে বদলে দিতে হবে। সুন্দর একটা কাহিনী রচনা করে সে তরুণীটীকে বোললো যে রাজকুমারী ক্রাম্সিনের অভিনন্দনের দিনে সে যে মুক্তার কলারটা পরেছিল সেটা ছিল একেবারে নকল। এই কথায় লিউকার্ডিস্ প্রতিবাদ করে উঠলো। যুবকটীর অভিনয় কৌশলে সে মুগ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইভ্জেনের জন্য তার দুর্ভাবনা কম হচ্ছিল না।

ওয়েটার ঘরের মধ্যে ঢুকে পেয়ালায় শ্যাম্পেন ঢেলে তাদের মুখের দিকে চেয়ে ভাবলো, এরা আসলেই প্রেমিক প্রেমিকা। হঠাৎ বেরসিকের মত উঠে পড়ে ইভ্জেন বেয়ারাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করলো। লিউকারডিসের অনুনয়সূচক চোখের প্রতি দৃষ্টি পড়তে সে

চমকে গেল। এই আকস্মিক আচরণে সে দুঃখিত এই ভাণ করে ইভ্‌জেন হাত দুটী বাড়িয়ে দিয়ে লিউকার্‌ডিসের দিকে এগিয়ে গেল। ওয়েটার এই দৃশ্যটী উপভোগ করছিল। তরুণীটীও দাঁড়িয়ে উঠে তার মাথাটী ইভ্‌জেনের বুকের মধ্যে রেখে চুপি চুপি তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে পরের দিনই গাড়ীর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে একটা আর্ত্তনাদের স্বর শোনা যেতে লিউকার্‌ডিস্ আতঙ্কে শিউরে উঠলো। ইভ্‌জেন দুশ্চিন্তার সঙ্গে দরজার দিকে তাকালো। খোলা দরজার সামনে দিয়ে একটা অর্দ্ধ উলঙ্গ নারী ছুটে গেল। ইভ্‌জেন এই দৃশ্য দেখে বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করে দিতে আদেশ কোরল। একটা গুলির আওয়াজ ও তার সঙ্গে একটা পুরুষের বিকট চীৎকারে সারা বাড়ীটা কেঁপে ওঠে। ইভ্‌জেন ভৃত্যটীকে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ কোরল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ক্রমশঃ জনতার কোলাহল চারিদিকে ছড়িয়ে পোড়ল। একটা আজ্ঞাসূচক কণ্ঠ নীচে থেকে শোনা গেল ও তার সঙ্গে আর একটা বুকফাটা কান্নার স্বরও কাণে এসে বাজলো। লিউকার্‌ডিস্ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে কৌচের ওপর হাত, পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পোড়ল।

রাস্তায় লোকের ভিড় জমে যায়, এর মধ্যে থেকে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর গলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেল। হলের ভেতরের পায়ের শব্দে অনুমান হোল কারুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওয়েটার এসে বোলল, "আপনাদের কোন চিন্তা নেই"; আবার লিউকার্‌ডিসের প্রতি কটাক্ষ ক'রে বোলল, "আপনি শান্ত হোন; এটা একটা সামান্য ব্যাপার, ছোটখাট রকমের একটা দুর্ঘটনা মাত্র; এতে আপনাদের বিচলিত হবার কিছু নেই।" এই কথাগুলি বলে সে বেরিয়ে গেল।

ইভ্জেন লিউকার্ডিসের পাশে বসে কম্পিত হস্তে মাঝে মাঝে তার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করছিল। তরুণীটী তার স্পর্শে শিউরে উঠে মাথা সরিয়ে নিতে চেষ্টা কোরল। ইভ্জেন হাত তুলে নিল, অবসাদে তার মন ভরে গেল। ঝড়ের ঝাপটা এসে জানালায় লাগছিল। তাদের মনে হচ্ছিল যেন বছর কেটে গেছে ; কত রকম বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই না তাদের সময় কাটছে। ইভ্জেন ভাবলো, এইখানেই কি সব শেষ ? আরও একটা রহস্যপূর্ণ রাত্রির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কি তাকে যেতে হবে না ? নানা রকম দুশ্চিন্তার কথা ভাবতে ভাবতে পাশের ঘরে গিয়ে সে শুয়ে পোড়ল। লিউকার্ডিস্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরল। বসবার ঘরে একটা আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল, কিন্তু এ ঘরটা ছিল একেবারে অন্ধকারে ভরা। আলোটা জ্বেলে লিউকার্ডিস্ দেখতে পেল একটা পাত্র জলে ভর্ত্তি রয়েছে। পুনরায় সে ইভ্জেনের ক্ষতস্থানটী পরিষ্কার করতে লাগলো। ব্যাগ থেকে নতুন ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে একখানা বইও বার করে ফেললো। তরুণীটী ইভ্জেনের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ জাড়িয়ে দিচ্ছে এমন সময় সে তাকে বই থেকে কিছু পড়ে শোনাতে অনুরোধ কোরল। বইখানি ছিল লারমোন্টভের কবিতার সঞ্চয়ন। কবিতা পড়ে শোনাবার সময় লিউকার্ডিসের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। ইভ্জেন তার নিদ্রায় কোন রকম বাধা দান করতে চাইলো না। যুবকটীর মন শান্তিতে যেন ভরে এলো। সে পা ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তরুণীটীর ঠোঁট দুটী মাঝে মাঝে নড়ে উঠছিল, আর ঘুমের ঘোরে হেসে উঠে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলছিল। তার হাত থেকে বইটা হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেল ; ভয়ে চোখ দুটী খুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার সে ঘুমিয়ে পোড়ল। ঘুমে তরুণীটী এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে ইভ্জেন যদি তাকে না ধরে ফেলতো তা'হলে সে মাটীতে নিশ্চয়ই পড়ে যেত।

ইভ্‌জেন তাকে নিজের বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে তার মাথাটী নিজের কোলের ওপর তুলে নিল। পরে তরুণীর বালিশে মাথা রেখে তার পাশে আস্তে আস্তে সে শুয়ে পোড়ল। আচ্ছাদনের ভেতর থেকে হাত বার করে তরুণীর পিঠের ওপর রেখে তার ঘুমন্ত দেহটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা কোরল। তরুণীর কোমল দেহের স্পর্শে তার মন পুলকিত হয়ে ওঠে। সে ভাবে লিউকার্‌ডিসের কষ্ট ও যত্নের প্রতিদান সে যেন দিচ্ছে। লিউকার্‌ডিস্‌কে এত কাছে পেয়েও তার মনে হচ্ছিল কত দূরেই না সে রয়েছে। বহুক্ষণ ইভ্‌জেনের চোখদুটী তরুণীটীর প্রতি নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু আসলে তার মনটা কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এই জর্জ্জরিত নিপীড়িত পৃথিবীর পটভূমিকার সম্মুখে সুন্দরা লিউকার্‌ডিসের অপরূপ সুষমা মণ্ডিত দেহ থেকে যেন একটা স্বর্গীয় জ্যোতি বেরিয়ে আসছিল। কিছু পরে রাস্তায় সৈনিকদের কুচ্‌কাওয়াজে তরুণীর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ইভ্‌জেন লিউকার্‌ডিসের গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বসে পোড়ল। সে লক্ষ্য কোরল যে তরুণীটীর মুখ বিস্ময়ে ভরে গিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে। লিউকার্‌ডিস্ ছোট রকমের একটা আওয়াজ করে দাঁড়িয়ে উঠে বুকে হাত রেখে বোবার মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। ইভ্‌জেনের কথাগুলি যেন তার কাণের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছিল না। মাঝে মাঝে আবহাওয়া, সময়ের গতি নিয়ে কথা বলে যুবকটা তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছিল; অন্যমনস্কভাবে তরুণীটী তার কথার জবাব দিয়ে যেতে লাগলো। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে লিউকার্‌ডিস্ শেষবারের মত ইভ্‌জেনের ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করে বেঁধে দিল। তরুণীর মনে হতে লাগলো বাইরের পৃথিবীটা যেন একটা বিরাট হিংস্র জন্তুর রূপ নিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ গ্রাস করতে আসছে।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বাজার সঙ্কেত ধ্বনি হোল। তাদের এখন

প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। ক্রমশঃ ইভ্‌জেনের চিত্ত স্থির হয়ে আসে; লিউকার্ডিসের ঘরে প্রবেশ করবার সময় তাকে খুব দুর্ব্বল দেখাচ্ছিল। সামনা-সামনি বসে তারা পরিত্রাণের সময়টীর জন্য নীরবে অপেক্ষা করছিল; রাস্তা থেকে গাড়ীর চাকার শব্দ আসার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটার ঘরে ঢুকে ইভ্‌জেনের সামনে বিলটা ধরলো। পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তারা নীচে নেমে গেল।

গাড়ী করে ষ্টেশনে যাবার পথে একটী জনপ্রাণীও তাদের চোখে পড়েনা। ওয়েটিং রুমের পাশে এনেস্‌থেসিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অভ্যর্থনা করে তিনি ইভ্‌জেনের স্বাস্থ্যের কুশল জানলেন। এনেস্‌থেসিয়া যুবকটীর হাতে একটী ব্যাগ দিয়ে তাকে প্ল্যাট্‌ফরম্ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। ইভ্‌জেন ট্রেণের মধ্যে ঢুকে গেল; একটু পরেই আবার নেমে এসে লিউকার্ডিসের হাত দুটী নিজের হাতের মধ্যে পুরে নিল। মনে হতে লাগলো যেন একসূত্রে গাথা দুটী ফুল। কিছুক্ষণ এইভাবে তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এনেস্‌থেসিয়া ইসারায় তাদের সতর্ক করে দিলেন। ছুটে গিয়ে গাড়ীতে উঠে সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয়। জানলার কালো ফ্রেম ও কুয়াসা ভেদ করে তার মুখখানি শাদা খড়ির তালের মত দেখায়। বাঁশী বেজে ওঠে। ট্রেণখানি ধীরে ধীরে প্ল্যাট্‌ফর্ম্ ছাড়িয়ে দূরে মিলিয়ে যায়।

লিউকার্ডিস্ বাড়ী ফিরে দেখলে, তার মা অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে আছেন। বৃদ্ধা তাঁর স্বামীকে মেয়ের চিঠির কথা বলতে সাহস করেননি। মা ও মেয়ের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেল। মার কাছে অনেক ভৎর্সনা তাকে শুনতে হয়; নীরবে সবই সে সহ্য করে গেল। মেয়ের প্রতি মা ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে ওঠে; লিউকার্ডিস্ ভাবী স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেই তাঁর বিরক্তির মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

লিউকার্‌ডিসের বাবাও তার ওপর বেশ একটু রুষ্ট হলেন। তরুণী একটী কথাও না বলে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। লিউকার্‌ডিসের এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌ ভেঙ্গে গেল। সে লোক জন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়ে নীরবে নিজের মধ্যে ডুবে যায়। ডাক্তাররা তাকে চেঞ্জে নিয়ে যাবার আদেশ কোরলেন। প্রথমে তার মা তাকে প্যারিসে নিয়ে গেলেন, তারপর তাকে জাহাজে করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বৃটেনে পৌঁছলেন।

একদিন রাত্রে সৈন্যাধ্যক্ষের স্ত্রী বেরিয়ে এসে দেখেন, লিউকার্‌ডিস্‌ তাঁরই ঘরের সংলগ্ন ছাদে শুয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীল আকাশের দিকে চোখ মেলে দিয়েছে।

ইভ্‌জেন্‌ কোথায় যেন চলে গেছে; লোকে বলে থাকে, পশ্চিম ক্যানাডার কোন গ্রামে সে ঘর বেঁধেছে। শুধু ক্লান্ত ইভ্‌জেনের মুখচ্ছবি লিউকার্‌ডিসের মনে মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যায়, আর ইভ্‌জেন সুন্দরী লিউকার্‌ডিসের মধুর অভিনয়ের কথা স্মরণ করে বিমনা হয়ে পড়ে।

জমিদারের ভাগ্য

মে মাসের এক সন্ধ্যায় ক্লেয়ার হেল্‌কে আবার রাণীর ভূমিকায় ষ্টেজে দেখা যায়। অভিনেত্রীর এ দু'মাস অনুপস্থিতির কারণ সকলেই জানে— মার্চ্চ মাসের পনের তারিখে যুবরাজ রিচার্ড বেডেন্‌ব্রক্ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন, তাঁর সেবার ভার ক্লেয়ার নিজের হাতে নেয়; অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেনি। শোকটা এত গভীরভাবে লেগেছিল যে সকলেই ভেবেছিল, ক্লেয়ার এ আঘাত হয়তো সহ্য করতে পারবে না। সকলের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়েছিল যে গায়িকার সুমধুর কোকিলকণ্ঠ হয়তো আর শোনা যাবে না। তাদের এই দুশ্চিন্তাকে ব্যর্থ করে দিয়ে যেদিন সে আবার ষ্টেজে অবতীর্ণ হয়, সেদিন দর্শকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। গ্যালারীর ওপর ফ্যাণীর শিশুসুলভ সুন্দর মুখখানি দেখা যায়, ওপরের দর্শকেরা তাদের ছোট বান্ধবীকে আবিষ্কার করে কম আনন্দ লাভ করেনি; সকলেই জানত যে ফ্যাণী সামান্য একজন দোকানের কর্ম্মচারীর মেয়ে হয়েও সুন্দরী ক্লেয়ারের সখ্যতা লাভ করেছে। ফ্যাণী ছিল ক্লেয়ারের গায়িকাদলভুক্ত বান্ধবীদের মধ্যে একজন। মাঝে মাঝে ক্লেয়ারের বাড়ীতে সে নিমন্ত্রিত হোত আর মৃত রাজকুমারের সঙ্গেও প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে সে একবার জড়িয়ে পড়েছিল।

ইণ্টারভ্যালের সময় ফ্যাণী তার বান্ধবীদের বোলল যে জমিদার লিসেন্‌ভগ্ ক্লেয়ারকে সেদিন সন্ধ্যায় রাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অনুরোধ করেন। জমিদার সামনের বক্সেই বসেছিলেন। পরিচিত ভদ্রমণ্ডলীর সাদর অভ্যর্থনা তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি,

কারণ সেদিনই সন্ধ্যায় লিসেন্‌ভগের মনে অনেকগুলি স্মৃতিবিজড়িত দুঃখের দিনের কথা ভেসে আসছিল। দশ বছর আগে জমিদারের সঙ্গে ক্লেয়ারের প্রথম পরিচয় হয়। একদিন সন্ধ্যায় জমিদার থিয়েটারে একটী দৃশ্যে সুন্দরী ক্লেয়ারকে ফিলিনের ভূমিকায় দেখতে পান ; তখন তিনি ছিলেন মাত্র পঁচিশ বছরের যুবক। অভিনয়ের শেষে তিনি ইসেন্‌ষ্টীনের সাহায্যে অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচিত হন ; ক্লেয়ারের কাছে প্রেম নিবেদন ক'রে তিনি বলেন যে সুন্দরীর বিলাস, প্রসাধন, অপেরার খরচ এ সবের জন্য তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় কোরতে তিনি প্রস্তুত।

ক্লেয়ারের মা ছিলেন পোষ্ট অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর স্ত্রী, মা ও মেয়ে এক সঙ্গেই বাস কোরত। ক্লেয়ারের সেই সময়ের প্রণয়ী ছিল মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র। যুবককে মাঝে মাঝে তরুণীর ঘরে চায়ের মজলিসে যোগ দিতে দেখা যেত, একথা জেনেও সুন্দরীকে পাবার কল্পনা জমিদারের মন থেকে মুছে যায়নি। প্রতি উৎসবেই জমিদার অভিনেত্রীকে ফুলের সঙ্গে অনেক রকমের উপহার পাঠিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে ক্লেয়ারের বাড়ীতে তিনি নিমন্ত্রিত হোতেন।

সেই বছর হেমন্তকালে ডের্ট্‌মণ্ডে অভিনয় করার অনুরোধ ক্লেয়ারের কাছে আসে। সেই সময় লিসেন্‌ভগ্ গভর্ণমেণ্টের একটী কাজে নিযুক্ত ছিলেন ; বড়দিনের ছুটীর সুযোগ নিয়ে সেবারে তিনি ক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা কোরতে যান। ছাত্রটী সেই বৎসর ডাক্তারি পাস করে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে জেনেও তিনি আর একবার ক্লেয়ারের কাছে প্রেম নিবেদন করেন। প্রত্যুত্তরে ক্লেয়ার সোজাসুজিভাবে জমিদারকে জানিয়ে দিল যে বর্ত্তমানে কোর্ট থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে তার একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ; শুধু জমিদারের চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁর সঙ্গে পার্কে গিয়ে আলাপ আলোচনা ক'রে অথবা থিয়েটারের রেস্তোরাঁতে

অভিনেতা অভিনেত্রী সমভিব্যাহারে নৈশ ভোজন করে তাঁকে আনন্দ দিতে পারে। নিরুৎসাহ না হয়ে লিসেন্‌ভগ্‌ ক্লেয়ারের দর্শন মানসে কয়েকবার ডেট্‌মণ্ডে গিয়ে তার অভিনয় কৌশলে মুগ্ধ হয়ে তাকে অন্তরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

পরের বৎসর ক্লেয়ার হ্যাম্‌বুর্গে গান গাইবার চুক্তি করে। সেবারেও জমিদারকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়, কারণ গায়িকা এক ডাচ্‌ বণিকের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে জড়িয়ে পড়ে। এই ডাচ্‌ বণিকের সংস্পর্শ থেকে সে আর্থিক অবস্থা অনেকটা ফিরিয়ে নেবে, আশা করেছিল।

তৃতীয় বৎসরে ড্রেস্‌ডেন্‌ কোর্ট থিয়েটারের সঙ্গে ক্লেয়ারের আর একটা চুক্তি হয়। এই বৎসরেই লিসেন্‌ভগ্‌ গভর্ণমেণ্টের কাজ ছেড়ে দিয়ে রমণীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ড্রেসডেন্‌ যাত্রা করেন। সেখানে ক্লেয়ার ও তার মা'র সঙ্গে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় আলাপ কোরতে যেতেন। ক্লেয়ারের মা'ও ছিলেন বুদ্ধিমতী, খুব চতুরতার সঙ্গে মেয়ের বন্ধু-বান্ধবীদের আদর আপ্যায়ন কোরতেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাচ্‌ ভদ্রলোকটী হঠাৎ একদিন তাঁর আগমনের কথা ক্লেয়ারকে চিঠিতে জানিয়ে সাবধান করে দিলেন যে তিনি তার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছেন, যদি রমণীর কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় মেলে তা'হলে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। ডাচ্‌ ভদ্রলোক নির্দ্দিষ্ট সময়ে না আসাতে ক্লেয়ার বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

লিসেন্‌ভগ্‌ ভাবলেন, এ সমস্যার সমাধান তিনি করেই ফেলবেন। এই স্থির করে তিনি ডেট্‌মণ্ডে ডাচ্‌ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ভদ্রলোক জানালেন শুধু যে তাঁর একটা জোর ও দাবী দেখাবার জন্যই তিনি এইভাবে ভয় দেখিয়ে চিঠি দেন; কোন বিষয়েই তিনি গভীরভাবে

জড়িয়ে পড়তে চান না। ভদ্রলোকের এই স্বীকারোক্তিতে জমিদারের মন আনন্দে ভরে গেল। লিসেন্‌ভগ্‌ ড্রেস্‌ডেনে ফিরে গিয়ে ক্লেয়ারের কাছে আসল ব্যাপারটা খুলে বলেন। ক্লেয়ার তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়, কিন্তু জমিদারের প্রেমনিবেদনে কোনই সাড়া দেয় না ; এই আচরণে লিসেন্‌ভগ্‌ যেন অবাক হয়ে গেলেন।

জমিদারকে বারে বারে প্রত্যাখ্যান করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ক্লেয়ার শুধু বলে যে জমিদারের অবর্ত্তমানে প্রিন্স্‌ কাজেটান্‌ তার প্রতি এমন গভীরভাবে আকৃষ্ট হন যে ক্লেযারকে তিনি একান্ত করুণভাবে বলেন, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান কোরলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবেন। যা'তে রাজসংসার ও দেশ দুঃখে ভেসে না যায় সেই ভেবে রাজকুমারের কথায় ক্লেয়ারকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিতে হয়। নিরুৎসাহ না হয়ে লিসেন্‌ভগ্‌ ড্রেস্‌ডেন্‌ পরিত্যাগ করে ভিয়েনায় গিয়ে উপস্থিত হন।

জমিদারেরই বহু চেষ্টায় ভিয়েনা অপেরায় গাইবার জন্য ক্লেয়ারের ডাক পড়ে। ক্লেয়ার অন্যান্য স্থানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় ক'রে অক্টোবর মাসে নির্দ্দিষ্ট অপেরায় এসে যোগ দিল। সন্ধ্যায় অভিনয়ের পর জমিদার সাজঘরে উপহারস্বরূপ তাকে একরাশ ফুল পাঠিয়ে দেন। অভিনেত্রীর মুখ দেখে লিসেন্‌ভগের মনে একটু আশার সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু যখন তিনি শুনলেন ক্লেয়ারের সহ-অভিনেতার সঙ্গে তার বেশ একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তখন তাঁর সে আশা সমূলে উৎপাটিত হোল।

সাত বছর কেটে গেল। অভিনেত্রীর মন চায় নিত্য নতুন। ফ্লেমেন নামে এক তরুণ নামজাদা জকির সঙ্গে ক্লেয়ার প্রেমাসক্ত হোল। ফ্লেমেনের পর এক গানের মাষ্টারের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ হয়। এর কিছুদিন পর জমিদার এল্‌বান্‌ রেটনির প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়েছিল, এই জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি জুয়া খেলায় নষ্ট হয়ে যায়।

পরের বছর এড্গার নামে এক কবির সঙ্গে ক্লেয়ার প্রণয়াসক্ত হয়। যুবকটী নিজের খরচেই থিয়েটারে বিয়োগান্ত নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা কোরত। মন তবুও নতুনের মোহে ভোলে ; এবারে উইল্হেল্ম্ নামে উনিশ বছরের এক তরুণের সঙ্গে সে জড়িয়ে পোড়ল। পরিচ্ছদের পারিপাট্যে তার সমকক্ষ সে সময় কেউই ছিল না, তার চেহারাও ছিল কন্দর্পের মত।

লিসেন্ভগের কাছে ক্লেয়ার কোন কথাই গোপন রাখেনি। নিজের ঘরে তরুণ তরুণীদের নিমন্ত্রণ করে আনন্দ বিতরণ করাই ছিল ক্লেয়ারের স্বভাব ; উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যেও তার খ্যাতি বড় কম ছিল না। বাজারে কোথাও মেলা বসলে সে একটা ষ্টল নিয়ে বোসত ; বড় ঘরের মেয়েরা ও ইহুদী ধনী সম্প্রদায় তার কাছ থেকে কিছু জিনিষ কিনে নিজেদের ধন্য মনে কোরত। ষ্টেজের দরজার সামনে দাঁড়ান উৎসুক যুবক-যুবতীদের প্রতি সে মধুর কটাক্ষপাত কোরত। জনতার প্রতি সে পুষ্প বর্ষণ কোরত, কেউ যদি ফুল না পেত তা'হলে তার প্রতি স্নেহের কটাক্ষপাত ক'রে মিষ্টি ভিয়ানিজ্ ভাষায় বোলত, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কাল আবার এমনিটী সময় এলে দেব, কেমন ?" এর পর সে গাড়ীর ওপর উঠে জানলা দিয়ে মুখ বার কোরে দুঃখিত জনতার প্রতি তাকিয়ে বোলত, "ফুলের সঙ্গে তোমাদের কফিও দেব।"

ফ্যাণীও ক্লেয়ারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ; তরুণীটির কথাবার্ত্তায় ও আচরণে সে এতই মুগ্ধ হয় যে ফ্যাণীকে পুনরায় তার কাছে আসতে অনুরোধ করে। ফ্যাণী নিয়মিতভাবে ক্লেয়ারের কাছে যাওয়া আসা আরম্ভ কোরল ; দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক আরও মধুর হলো। ফ্যাণী যে সমস্ত দোকানদারের ছেলেদের সঙ্গে নাচতে যেত, তাদের অনেকের কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব তার কাছে এসেছিল। ফ্যাণী তাদের কথায়

সম্মতি দিতে পারেনি, কারণ সে ক্লেয়ারের প্রশংসাকারী বন্ধুটীর সঙ্গে জীবনে এই প্রথম প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে।

ক্লেয়ার যুবরাজ ব্রাডেন্‌ব্রককে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসতো। লিসেন্‌ভগ্‌ বহুবার ব্যর্থ মনোরথ হয়েও ক্লেয়ারকে পাবার আশা ছাড়তে পারেন নি; দশ বৎসর ধরে যে আনন্দের প্রত্যাশী তিনি হয়েছেন, তা বুঝি আর ফলপ্রসূ হয় না। যখনই ক্লেয়ার কারুকে প্রত্যাখ্যান করে, তখনই লিসেন্‌ভগের মনে আশার সঞ্চার হয় যে হয়ত এইবারেই তাঁর প্রেমাস্পদকে পেয়ে যাবেন। যুবরাজের মৃত্যুর পর জমিদার তাঁর সুন্দরী রক্ষিতাকে ত্যাগ করে ভাবলেন, এবারে হযতো তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। যুবরাজের মৃত্যুতে তরুণীটী এতই গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়ে যে সকলেরই মনে হয়, ক্লেযার প্রেমের প্রকৃত আস্বাদন থেকে চিরকালের মত বঞ্চিত হোল।

ক্লেয়ার প্রতিদিনই যুবরাজের কবরের ওপর ফুল রেখে আসে; বেশভূযার মধ্যেও তার অসম্ভব পরিবর্ত্তন দেখা যায; চটকদার গাউন অথবা মূল্যবান অলঙ্কার ব্যবহার করা সবই সে একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা ও অনুরোধ ক'রে তাকে ষ্টেজে আটকাতে হয়। এই ঘটনার পর ক্লেয়ার যখন আবার ষ্টেজে নামে, তার বাইরের আচরণে শোকের কোনই আভাস পাওয়া যাযনি। শুধু পূর্ব্বের পরিচিত কয়েকটী বন্ধু ও বান্ধবীর সঙ্গে মেলামেশা কোরতে দেখা যেত।

যুবরাজের দুটী মাসতুতো ভাইএর সঙ্গে সে হাল্কাভাবে প্রেমের অভিনয় কোরত। একদিন ফরাসী রাষ্ট্রদূতের দপ্তরের একটী ভদ্রলোক ও আরেকজন চেক্‌ পিয়ানো-বাদক ক্লেয়ারের দর্শন মানসে উপস্থিত হয়। এগারই জুন তারিখে পুর্বরায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে উপস্থিত হ'য়ে ক্লেয়ার সকলের মনে চমক লাগিয়ে দেয়। যুবরাজের মাসতুতো

ভাই লুসিয়াস্ ছিল কবি প্রকৃতির যুবক, সে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রেম নিবেদন কোরলে ক্লেয়ারের মন পুলকিত হোত বটে, কিন্তু অন্তরাত্মা সাড়া দিত না। ক্লেয়ারের কোন পুরোন বন্ধু বা বান্ধবী প্রেম ও অনুরাগ নিয়ে আলোচনা কোরলেই তার মুখ থেকে খুসির হাসি মিলিয়ে যেত। মাঝে মাঝে সে ওপরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতো যে পৃথিবীর সকল পুরুষকেই উদ্দেশ্য করে কি যেন সে বলতে চায়।

জুন মাসের মাঝামাঝি উত্তর প্রদেশ থেকে ওল্‌সি নামে একজন গায়ক এসে থিয়েটারে ওয়েগ্‌নারের স্বরলিপি থেকে একটী গান আরম্ভ ক'রে দেয়। তার গলার স্বর উচ্চগ্রামে উঠতো বটে, কিন্তু তা' থেকে তাকে প্রথম স্তরের গায়ক বলা চলে না। তার দেহ ছিল খুব বলিষ্ঠ, কিন্তু মুখের প্রকাশভঙ্গী মোটেই চিত্তাকর্ষক ছিল না; কিন্তু তবুও গানের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ থেকে এমন একটা দীপ্তি ফুটে বেরিয়ে এসে তার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যকে বিকসিত করে দিত যে কোন তরুণীই তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। ক্লেয়ার গায়িকাদের সঙ্গে থিয়েটারের বক্সে স্থির চিত্তে বসে তার অভিনয় লক্ষ্য করে।

পরেরদিন প্রভাতে ওল্‌সির সঙ্গে ম্যানেজারের আফিসে ক্লেয়ারের পরিচয় হয়। অভিনেত্রী তার সঙ্গে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিল বটে, কিন্তু ওল্‌সির গত সন্ধ্যায় অভিনয়ের সম্বন্ধে সে কোন উল্লেখই কোরল না। সেদিন সন্ধ্যায় ওল্‌সি অনিমন্ত্রিতভাবে ক্লেয়ারের কাছে উপস্থিত হয়। লিসেন্‌ভগ্‌ আর ফ্যানিও সেখানে উপস্থিত ছিল; তারা ওল্‌সির সঙ্গে একত্রে বসে চা পান কোরল।

চায়ের টেবিলে ওল্‌সি তার জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলে,—"একবার একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আমার গানে এতই মুগ্ধ হন যে জাহাজ থেকে তিনি নেমে আসেন; কিন্তু এই সঙ্গীতের পেছনে কি যে বেদনা

ছিল তাতো তিনি জানতেন না। আমার নববিবাহিত ইটালিয়ান স্ত্রীকে নিয়ে অনন্ত সমুদ্রের মাঝে পাড়ি দিয়েছিলাম ; কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতা বিমুখ হলেন, তাকে চিরকালের জন্য সমুদ্রেই ফেলে আসতে হয়।" কোন রকমের দুঃখের ছোঁয়াচে অভিনেত্রীর মনে যুবরাজের স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। গায়কের দুঃখের গাথা শুনে ক্লেয়ার সকলের অলক্ষ্যে বেশ একটু বিচলিত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখের স্বাভাবিকভাব ফিরিয়ে আনে ; এটা লিসেন্‌ভগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় না।

ওল্‌সি বিদায় নিল, কিন্তু অন্য সকলে সেখানে কিছুটা সময় মৌন হয়ে বসে রইলো। এরপর ওল্‌সি কয়েকটা উচ্চাঙ্গের সুর আলাপ করে ; ক্লেয়ার গানের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত স্থির হয়ে ব'সে শুনে যায়। প্রতিদিনই বিকেলে ক্লেয়ারের বাড়ীতে গায়ককে দেখা যেত। এর মাঝে একদিন ক্লেয়ার ফ্যাণীকে সঙ্গে করে যুবরাজের কবরের ওপর একটা ক্রুশ চিহ্ন রেখে আসে।

জুন মাসের শেষের দিকে একদিন ওল্‌সি ওযেগনারের স্বরলিপি থেকে শেষবারের মত কয়েকখানা গান গেয়েছিল। গায়কের বিদায় উপলক্ষে ক্লেয়ার একটা বড় রকমের ভোজ দেয় ; অভিনেত্রীর বন্ধু ও বান্ধবীরা সকলেই তাতে উপস্থিত ছিল। গায়ক ক্লেয়ারের প্রতি যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল, একথা সকলেই জানতো। ভোজের সময় আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে ওল্‌সির সঙ্গে লিসেন্‌ভগের একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওল্‌সি ফ্যানিকে সম্বোধন করে কথা বলতে সে বেশ একটু বিচলিত হয়ে ওঠে। আবার যখন ওল্‌সি জানায় যে শীঘ্রই সে এদেশ ছেড়ে চলে যাবে, ফ্যাণী আর থাকতে পারে না, অশ্রুধারায় তার বসন সিক্ত হয়ে যায়, কিন্তু ক্লেয়ারের মধ্যে কোন চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায় না। অন্য অতিথিদের যে ভাবে ভাষণ করে, ঠিক সেইভাবেই ক্লেয়ার তার সঙ্গে

কথা বোল্‌ল। ওল্‌সি ক্লেয়ারের হাতে ওষ্ঠের স্পর্শ বুলিয়ে দেয়; তার চাহনি থেকে একটা হতাশার ভাব ফুটে ওঠে; কিন্তু তরুণীর চিত্ত জলের মতই স্থির থাকে। লিসেন্‌ভগ্‌ তাদের এই গতিবিধিকে সন্দেহের চোখে দেখে। অনুষ্ঠানের শেষে অভিনেত্রীর একটা আচরণে লিসেন্‌ভগ বিচলিত হয়ে ওঠেন। গায়ক তরুণীকে যেই অভিনন্দন জানিয়ে চলে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ক্লেয়ার তার হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে কানে-কানে বলে, "বন্ধু, আবার আসা চাই।" গায়ক তার কথা যেন শুনেও শুনতে পায় না, এমন সময় ক্লেয়ার তার ঠোঁট দুটী কানের কাছাকাছি এনে আবার আরম্ভ করে, "বন্ধু আসা চাই-ই, পথ চেয়ে বসে রইলুম, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতেই হবে।"

আনন্দিত চিত্তে গায়ক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। জমিদার ভদ্রলোক ফ্যানি ও গায়ককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর হোটেলে যান। কিছু পরে ফ্যানির হাত ধরে জনশূন্য রাস্তা দিয়ে রাত্রের স্নিগ্ধ বায়ু উপভোগ করে চলতে চলতে ওল্‌সির যেন মনে হোল তরুণীর গাল বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে। তাকে বিদায় দিয়ে গায়ক গাড়ীতে ক'রে আবার ক্লেয়ারের আবাসে গিয়ে উপস্থিত হোল। ক্লেয়ারের ঘর থেকে একটা ফিকে আলো বেরিয়ে আসছিল, জানালার ভেতর থেকে তরুণীর গলা বেরিয়ে এসে মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি দিয়ে গায়ককে অভ্যর্থনা কোরল। বিরহিনী, ওল্‌সির প্রতীক্ষায়-ই বসে ছিল।

পরের দিন সকালে লিসেন্‌ভগ্‌ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরুলেন; সেদিন যেন তাঁর চিত্তাকাশে আনন্দের ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল। জমিদার ভবিষ্যতের দিনগুলির কথা ভাবেন; ক্লেয়ার তাঁকে এইভাবে আর কতদিন বঞ্চনা করবে, আর কতদিনই বা সে অভিনেত্রীর জীবন যাপন করবে? আবার তাঁর মনে হয়, হয়তো সময় এগিয়ে আসছে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই হয়তো ক্লেয়ার ষ্টেজ থেকে বিদায় গ্রহণ করবে; তারপর দুজনে

বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়ে ভিয়েনার কাছাকাছি কোথাও একটা ঘর বেঁধে নেবেন। আবার কল্পনার স্বপ্ন দেখেন—তাঁরা যেন পৃথিবী প্রদক্ষিণ কোরবেন, কখনও স্পেনে দিন কাটাবেন, কখনও ইজিপ্টে আবার কখনও বা ভারতবর্ষে। ঘোড়ার পিঠে এই রকম কল্পনার জাল বুনতে বুনতে তিনি বাড়ীর সামনে এসে পৌছলেন। কোচম্যানের হাতে একরাশ গোলাপ দিয়ে অভিনেত্রীর হাতে পৌছে দিতে আদেশ কোরলেন।

একলাই খাওয়া শেষ ক'রে জমিদার শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিলেন। অভিনেত্রীর চিন্তায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়; অন্য কোন নারীই তাঁর মনে এতটা দোলা দিতে পারেনি; চিত্তবিনোদনের জন্য কয়েকটী সুন্দরী নারীর সঙ্গলাভ ক'রেছেন মাত্র। কল্পনার রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে লিসেন্‌ভগ ভাবেন একদিন হয়তো আসবে, যেদিন ক্লেয়ার তার অন্তরের দ্বার খুলে মধুর স্বরে বোলবে, "প্রিয়তম, এসো; তোমারই জন্য এখানে আসন বিছিয়ে রেখেছি; তুমিই একমাত্র এই শূন্য আসনের অধিকারী; এসো।" লিসেন্‌ভগের মাথার মধ্যে এই ধরণের চিত্রগুলি ভেসে আসে। তাঁর আবার মনে হয়, পৃথিবীতে ক্লেয়ার তাঁকে ছাড়া আর কাকেও ভালবাসার কল্পনাও ক'রতে পারে না।

জমিদার বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে পরিচিত পথ দিয়ে অভিসারে চললেন। গ্রীষ্ম আগতপ্রায়। তিনি স্বপ্ন দেখেন, নির্বিঘ্নে দু'জনে মিলে ভ্রমণপথে পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য ও সমুদ্রের বিরাটত্ব উপলব্ধি কোরবেন। স্বপ্নের ঘোর কেটে যেতে তিনি দেখেন সামনেই ক্লেয়ারের বাড়ী। উদাস দৃষ্টিতে অভিনেত্রীর জানালার দিকে তাকাতে তাকাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দরজায় মৃদু করাঘাত ক'রে কোনই উত্তর না পেয়ে আবার দরজায় আঘাত ক'রে যান; কিন্তু দরজা খোলে না। হতাশ হয়ে আবিষ্কার করেন, যে দরজার গায়ে ক্লেয়ারের নামের পরিবর্ত্তে আরেকজনের নাম লেখা রয়েছে।

লিসেন্‌ভগ্ বিস্মিত হয়ে নীচে নেমে গিয়ে চাকরের কাছে অনুসন্ধান ক'রে জানলেন, ক্লেয়ার কোথায় চলে গিয়েছে। দ্রুতগতিতে রাস্তায় নেমে পড়লেও অজান্তে কখন তাঁর দৃষ্টি তরুণীর বাড়ীর দিকে ফিরে আসে। অন্যদিন সন্ধ্যার রক্তরাগে অভিনেত্রীর গৃহ কি অপূর্ব্বই না দেখাত, কিন্তু আজকের এই দৃশ্য তাঁর মনে একটুও রেখাপাত ক'রতে পারলো না ; শুধু পানপাত্রই যেন পড়ে আছে, তাতে সুরা নেই।

সত্যই কি ক্লেয়ার চলে গেল? আর কি সে ফিরবে না? এই ধরণের দুশ্চিন্তায় অভিভূত হয়ে লিসেন্‌ভগ থিয়েটারের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাবার সময় তাঁর মনে পড়ে, দু'দিন আগেইতো তাকে অভিনয় ক'রতে দেখা যায়নি। চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে তিনি রিঙ্গেসারের বাড়ীর দিকে যান। পরিচারিকা দরজা খুলেই জমিদারকে চিনতে পেরে অভিনন্দন করলো। রিঙ্গেসার আসতে লিসেন্‌ভগ তার কাছে ফ্যানির খবর জানতে চান। রিঙ্গেসার তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললো, ফ্যানি বাড়ীতে নেই, ক্লেয়ার তাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটীর দিনগুলি কাটাতে গেছে।

জমিদার—কোথায় সে গেছে জানেন?

রিঙ্গেসার—তা'তো বলতে পারি না ; আজ সকালে আটটা পর্য্যন্ত ক্লেয়ার এখানে ছিল, অনেক অনুরোধের পর আমার কাছে মত পেয়ে ফ্যানিকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

লিসেন্‌ভগের মনে প্রশ্ন আসে, তারা কোথায় যেতে পারে? কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মহিলার সঙ্গে করমর্দ্দন করে বিদায় গ্রহণ করেন। কোচম্যানকে সোজা হোটেল ব্রিষ্টলে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। ওল্‌সি এখনও স্থান পরিত্যাগ করেনি, সে লিসেন্‌ভগকে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ভিয়েনায় তার সঙ্গে শেষ সন্ধ্যা কাটাতে অনুরোধ করে।

জমিদার ওল্‌সির বর্ত্তমানে ভিয়েনায় অবস্থানে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হযে যান। ওল্‌সি ক্লেয়ারের সম্বন্ধে কথা ব'লতে আরম্ভ করে। গায়কের সহানুভূতিতে লিসেন্‌ভগের চোখ জলে ভরে আসে; গায়ক আগ্রহান্বিত হয়ে জমিদারের কাছ থেকে ক্লেয়ারের সবিশেষ জানতে চায়। লিসেন্‌ভগ ওল্‌সির বাক্সের ওপর ব'সে তরুণীর গুণাগুণ বর্ণনা ক'রে যান। ক্লেয়ারের সম্বন্ধে কথা ব'লতে ব'লতে জমিদারের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। গায়কের কাছে শুধু যে কথাগুলি ব'ললে অভিনেত্রীর সম্মানে আঘাত লাগতে পারে, সে কথাগুলি তিনি একেবারে গোপন রেখে যান। ওল্‌সি মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনে যায়।

নৈশ ভোজনের সময় ওল্‌সি লিসেন্‌ভগকে তার জমিদারীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে। জমিদার গাযকের এই অনুরোধে খুসী হ'যে গ্রীষ্মকালে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রবেন প্রতিশ্রুতি দেন।

আহারের শেষে তাঁরা দুজনেই ষ্টেশনের অভিমুখে রওনা হ'ন। পথে ওল্‌সি বলে, "জানেন, আমি খুব মন-খোলা প্রকৃতির লোক। ব'লতে বাধা কি, ক্লেয়ারের বাতাযনের দিকে আমার একবার তাকাতে ইচ্ছে হচ্ছে।" লিসেন্‌ভগ আড়চোখে একবার ওল্‌সির দিকে তাকান। অভিনেত্রীর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময় ওল্‌সি কয়েকটি উড়ন্ত চুম্বন ছেড়ে ব'লে উঠলো, "সুন্দরী, বিদায, বিদায়।" লিসেন্‌ভগ বোল্‌লেন, "ক্লেয়ার ফিরে এলে আপনার এই অভিনন্দন বাণী আমি নিজেই বহন ক'রে দেব।" ওল্‌সি তাঁর এই কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যায়। লিসেন্‌ভগ আবার আরম্ভ করেন, "আজ সকালে কারুকে একটী কথাও না ব'লে ক্লেয়ার চলে গেছে। ওল্‌সি একটু বিস্মিত হ'য়ে বলে. "চলে গেছে?" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, গাড়ীতে

দু'জনেই স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিলেন। ট্রেন ছাড়ার আগে পরস্পর পরস্পরকে একান্ত পরিচিত বন্ধুর মত আলিঙ্গন কোরল। . .

সেই রাত্রে জমিদার তাঁর বিছানায় শুয়ে ছোট শিশুর মত গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠেন। ক্লেয়ারের সঙ্গে কাটান মধুর রাত্রিগুলির তুলনায় আজকের রাত্রির কতই প্রভেদ রয়েছে; দুঃখে, বিরহে ভদ্রলোক আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন। তাঁর মনে পড়ে, শেষ মিলনের রাত্রে ক্লেয়ারের মধ্যে তিনি একটা উন্মাদনার ভাব লক্ষ্য করেন। এর তাৎপর্য্য তিনি এখনই উপলব্ধি ক'রতে পারলেন। যুবরাজের প্রেতাত্মা ক্লেয়ারের চারিপাশে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে; হয়তো ক্লেয়ারকে চিরকালের মত হারাতে হবে, এই ভেবে তিনি শিউরে ওঠেন।

লিসেন্‌ভগ্ কয়েকদিন ভ্রাম্যমানের মত ভিয়েনার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন; কি ভাবে তিনি দিন কাটাবেন কিছুই স্থির ক'রতে পারেন না; কখনও ব্রিজ খেলে, কখনও তাস খেলে, কখনও বা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর দিন কেটে যায়; কিছুতেই তাঁর মনের স্থিরতা ফিরে আসে না। তিনি ভাবেন, তাঁর সব কিছুই নির্ভর করছে ক্লেয়ারের ওপর; সমগ্র ভিয়েনা সহরটা যেন একটা কুয়াসার চাদরে ঢেকে গেছে। যে সমস্ত লোকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তার মধ্যে আন্তরিকতার একান্তই অভাব দেখা যায়। একদিন সন্ধ্যায় লিসেন্‌ভগ্ ষ্টেসনে গিয়ে ইস্‌চেলের টিকিট কাটেন। সেখানে অনেক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, তারা জমিদারের কাছে ক্লেয়ারের খবর জানতে চায়। তিনি অত্যন্ত কর্কশ ও অপমানজনক স্বরে জবাব দেওয়ায় কলহের সৃষ্টি হয়, এমন কি তাঁর সঙ্গে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ে যায়; একটা গুলিও পর্য্যন্ত তাঁর কাণ ঘেঁসে বেরিয়ে যায়, ফলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে সেস্থান পরিত্যাগ ক'রে যেতে হয়। এখান থেকে লিসেন্‌ভগ টাইরলে যান,

সেখান থেকে ওবারল্যাণ্ড, ওবারল্যাণ্ড থেকে জেনেভা হ্রদ, জেনেভা হ্রদ সাঁতরে পার হ'য়ে তিনি পার্ব্বত্য উপত্যকায় গিয়ে পড়েন ; উপত্যকা থেকে কয়েকটী পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করেন। কিসে যে তিনি শান্তি পাবেন, কিছুই ঠিক ক'রতে পারেন না।

একদিন লিসেন্‌ভগ ভিয়েনা থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে খুলে দেখেন, "যদি আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু হন, বিলম্ব না ক'রে অবিলম্বে চলে আসুন—ওলসি।"

লিসেন্‌ভগ্ ভাবলেন, এই টেলিগ্রামের সঙ্গে হয়তো ক্লেয়ারের কিছু একটা সম্পর্ক আছে। অবিলম্বেই তিনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এইক্স পরিত্যাগ করে হ্যাম্‌বুর্গ হ'যে সোজা মিউনিকে গেলেন, সেখান থেকে জাহাজে ক'রে এক সুপ্রভাতে মোল্ডে এসে পৌছলেন।

এই দীর্ঘ ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যেও লিসেন্‌ভগ্ কোনরূপ শান্তি পান না। ক্লেয়ারের চেহারাও তিনি স্মরণ ক'রতে পারছিলেন না, গানের মধুর স্বরও তাঁর মনে আসছিল না। লিসেন্‌ভগের মনে হোল যেন দশ বছর তিনি ভিয়েনা পরিত্যাগ করেছেন। সাদা ফ্ল্যানেল সুট্-পরা ওল্‌সিকে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জমিদার আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন। ডেকের ওপর থেকে গায়কের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির বিনিময় হয়ে গেল। জাহাজ থেকে লিসেন্‌ভগ্ তীরে নেমে এলেন।

ওলসি আরম্ভ কোরল, "বন্ধু, এইভাবে এখানে আসার জন্যে আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। জানেন, আমার অবস্থা হ'য়ে এসেছে।"

জমিদার তার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে তার মুখটা খুব ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আর চুলগুলিও সাদা হ'য়ে গেছে। লিসেন্‌ভগ্ উদগ্রীব হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কি ব্যাপার বলুন ত, আপনার কি হয়েছে ?"

ওলসি—আপনাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বোলব।

লিসেন্‌ভগ্‌ ওল্‌সির গলার আওয়াজে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা অনুভব কোরলেন। তাঁরা উভয়েই নীল সমুদ্রের ধারে মনোমুগ্ধকর এভেনিউ-এর মধ্য দিযে গাড়ী ক'রে চললেন, দুজনেই মৌন হ'য়ে বসেছিলেন। লিসেন্‌ভগ্‌ একটিও প্রশ্ন না ক'রে অনন্ত জলরাশির দিকে উদাসনেত্রে তাকিয়েছিলেন। ছোট ছোট ঢেউগুলিকে অকারণ তিনি গুণে যান, উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয় যেন তারাগুলি আস্তে আস্তে খসে প'ড়ে পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে। অবশেষে মনে হোল, ক্লেযার নামে কোন এক গায়িকা যেন পৃথিবীর এক প্রান্তে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। গাড়ী এসে একটি সাদা বাড়ীর সামনে দাঁড়ায। সন্ধ্যায় তাঁরা বারান্দার ওপর বসে আহার ক'রছিলেন, সামনেই চোখে পড়ছিল দিগন্তব্যাপী নীল সমুদ্র। একজন বেয়ারা মাঝে-মাঝে খালি পেয়ালায সুরা ঢেলে দিচ্ছিল। লিসেন্‌ভগ্‌ হঠাৎ বলে ওঠেন "ভাল কথা, আপনি যে চুপ করে রইলেন।"

ওল্‌সি সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, "আমার কোনই মূল্য নেই, আমি শেষ হ'য়ে গেছি।" প্রত্যুত্তরে জমিদার বলেন "আপনি কি ব'লছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না; আপনার জন্য আমি কি কোরতে পারি, বলুন?" "কিছুই না" এই কথা বলার পরে ওল্‌সির দৃষ্টি ক্রমশঃ টেবিল ক্লথের ওপর থেকে গিয়ে পড়লো বারান্দায়, বারান্দা থেকে বাগান, বাগান থেকে নীল সমুদ্রের দিকে।

লিসেন্‌ভগ্‌ হতভম্ব হয়ে যান; নানা প্রকারের দুশ্চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে জমা হোতে থাকে; তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, "ক্লেয়ার কি তবে মরে গিয়েছে? ওল্‌সি কি তাকে হত্যা ক'রেছে? অথবা ক্লেয়ারকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে? ওল্‌সিও কি মরে গেছে?" আবার তাঁর মনে হয়, "না তা অসম্ভব; সামনেই ত তাঁর বন্ধু বসে রয়েছে; কেন ভদ্রলোক কথা

বলছেন না ?" লিসেন্‌ভগ্‌ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, "ক্লেয়ার কোথায় ?" ওল্‌সি আস্তে আস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। সামনে উপবিষ্ট বন্ধুকে দেখে জমিদারের মনে হোল ঠিক থিয়েটারের সংএর মত মুখোস প'রে ওল্‌সি যেন তাঁর দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে আছে।

বারান্দার রেলিংএর ওপর ঝোলান সবুজ শালটি দেখে তাঁর পরিচিত পুরাণো বন্ধু ব'লে ভ্রম হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর ঘোর কেটে যায় ; আবার স্থির ও মার্জ্জিতস্বরে তিনি বলে ওঠেন, "ক্লেয়ার কোথায় ?" গায়ক ভদ্রলোক কয়েকবার মাথা নেড়ে বলেন, "তার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা ক'রতে হবে। সত্যিই কি আপনি আমার বন্ধু, বলুন ?"

লিসেন্‌ভগ্‌ মাথা নেড়ে বলেন—সত্যিই আমি আপনার বন্ধু, আমায় কি ক'রতে হবে বলুন ?"

ওল্‌সি বোলল, "আপনার কি মনে আছে, সন্ধ্যায় ভিয়েনা পরিত্যাগের আগে ব্রিষ্টল হোটেলে আপনার সঙ্গে একত্রে বসে আহার করার পর, দুজনে মিলে ষ্টেসনে গেলাম। লিসেন্‌ভগ্‌ আরেকবার মাথা নাড়লেন।"

ওল্‌সি—ক্লেয়ার যে ওই একই ট্রেণে ভিয়েনা পরিত্যাগ করেছিল, আপনার এ বিষয়ে একেবারে ধারণা ছিল না, নিশ্চয় ?

লিসেন্‌ভগের মাথাটা নীচের দিকে নুয়ে পোড়ল। ওল্‌সি আবার সুরু কোরল—"তার ভিয়েনা ত্যাগ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। সকালে একটা ষ্টেসনে নেমে প্রাতঃরাশের সময় আমি ক্লেয়ারকে আবিষ্কার ক'রে ফেলি, দেখলাম ক্লেয়ার ফ্যানির সঙ্গে একত্রে খাবার ঘরে বসে কফি পান ক'রছে।"

জমিদার—বলে যান বন্ধু।

ওল্‌সি—সেদিন সকালে ক্লেয়ার ফ্যানি ও আমি অষ্ট্রিয়ার লেকের ধারে একটি সুন্দর কক্ষে সময় কাটাই, বেশ আনন্দেই আমরা ছিলাম।

গায়ক ভদ্রলোকটি এত অস্পষ্টভাবে কথা বলছিল যে লিসেন্‌ভগের মনে হোল, তার যেন মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

লিসেন্‌ভগ্ আবার ভাবল, কেন সে আমায় ডেকেছে, সে আমার কাছে কি চায়? ক্লেয়ার কি কোন গোপন কথা তাকে বলেছে? কেন গায়কটী আমার প্রতি ওইভাবে তাকাচ্ছে? কেন আমি বারান্দায় একজন সংএর সঙ্গে এইভাবে বসে আছি? একি শুধুই স্বপ্ন, সম্ভবতঃ আমি এখনও ক্লেয়ারের বাহুবন্ধনের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছি, এখনও আমাদের রাত্রি বুঝি শেষ হয়নি; এই রকম চিন্তা ক'রতে ক'রতে তাঁর মুদ্রিত চোখ দুটী হঠাৎ খুলে গেল। ওল্‌সি হঠাৎ ব'লে উঠল, "আপনি প্রতিশোধ নেবেন না?"

জমিদার—প্রতিশোধ নেব, কেন কিসের জন্য? ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওল্‌সি—কারণ, সে আমায় নষ্ট ক'রে ফেলেছে; আমি একেবারে শেষ হয়ে গেছি।

লিসেন্‌ভগ্—সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলুন।

ওল্‌সি—ফ্যানি আমাদের সঙ্গেই ছিল, সে খুব চমৎকার মেয়ে, নয় কি?

লিসেন্‌ভগ্—হ্যাঁ, খুবই চমৎকার মেয়ে সে।

তারপর আবছা আলোর ঘরের মধ্যে নীল ভেলভেটে মোড়া আসবাব-গুলি তাঁর চোখে পোড়ল; জমিদারের মনে হোল যেন শত বৎসর পূর্ব্বে এই ঘরেই ফ্যানির মার সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়েছিল। লিসেন্‌ভগ্ বোললেন, "থামলেন কেন, ব'লে যান।"

ওল্‌সি—একদিন সকালে গিয়ে দেখি ক্লেয়ার নিদ্রিত; একটু বেলাতেই তার ঘুম ভেঙ্গে থাকে। আমি আর কি করি, বনপথ ধরে বেড়াতে চলে

গেলাম ; হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি ফ্যানি আমার দিকে দৌড়ে আসছে ; চীৎকার ক'রে সে ব'লে ওঠে, "আপনি পালিয়ে যান, আমার একান্ত অনুরোধ, দেরী কোরবেন না, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা বিপদের বেড়াজাল দিয়ে আপনাকে কারা ঘিরতে আসছে।" এর পর সে আর কিছুই বোলল না। আমি বুঝতে পারলাম, কি বিপদের কথা সে অনুমান ক'রছে। ফ্যানির স্থির বিশ্বাস ছিল, আমি ইচ্ছা ক'রলেই এই বিপদ থেকে নিজেকে বাচাতে পারি।

রেলিংএর ওপরের সবুজ শালটী হঠাৎ জাহাজের পালের মত ফুলে উঠলো, টেবিলের ওপরের আলোটা থেকে থেকে দপ দপ করে উঠছিল। লিসেন্‌ভগ্‌ আগ্রহের সঙ্গে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ফ্যানি আপনাকে কি বলেছিল ?

ওল্‌সি—সেদিনের সন্ধ্যার কথা কি আপনার মনে আছে ? আমরা দু'জনেই সেদিন ক্লেয়ারের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলাম। তার ঠিক পরের দিন ক্লেয়ার ফ্যানিকে সঙ্গে নিয়ে যুবরাজের কবরস্থানে উপস্থিত হ'য়ে একটা ভীতিজনক রহস্যের কথা তার কাছে ব্যক্ত করেছিল।

জমিদার কম্পিতস্বরে ব'লে উঠলেন, "ভীতিপূর্ণ এক গুপ্ত রহস্য! কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

ওল্‌সি—আপনি বোধ হয় জানেন যে, যুবরাজ ঘোড়া থেকে প'ড়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন ?

লিসেন্‌ভগ্‌—আমি জানি।

ওল্‌সি—শুধু একমাত্র ক্লেয়ারই যুবরাজের পাশে উপস্থিত ছিল।

লিসেন্‌ভগ্‌—সে কথাও জানি।

ওল্‌সি—যুবরাজ অভিনেত্রীর প্রতি তাকিয়েছিলেন, আর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি একটা অভিসম্পাতও দিয়ে গিয়েছিলেন।

জমিদার—অভিসম্পাত !

ওল্‌সি—হ্যাঁ, যুবরাজ ক্লেয়ারকে বলেছিলেন "আমি যাবার আগে একটা অভিসম্পাত রেখে যাচ্ছি। দেখো, আমাকে তুমি ভুলো না ; ভুলে গেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।" প্রত্যুত্তরে ক্লেয়ার বলেছিল, "আমি ভুলব না।" যুবরাজ পুনরায় ক্লেয়ারকে শপথ গ্রহণ করিয়ে বলেছিলেন, "প্রতিজ্ঞা কর, ভুলবে না আমায় ?" ক্লেয়ার প্রত্যুত্তরে বলেছিল, "প্রিয়তম, আমি ভুলব না, ভুলব না।" যুবরাজ আবার বল্‌লেন "ক্লেয়ার, তোমাকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি ; এইবারে আমি পৃথিবীর কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রছি।"

জমিদার চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন,—কে কথা বলছে ?

ওল্‌সি উত্তরে বোল্‌ল, "আমি। ফ্যানি আমায় যে কথাগুলি বলেছিল, আমি শুধু তারই উল্লেখ ক'রছি। ফ্যানির সঙ্গে ক্লেয়ারের যা' আলোচনা হয়েছিল, সমস্তই সে আমার কাছে খুলে বলেছে। ক্লেয়ারের সঙ্গে যুবরাজের যা' কথাবার্ত্তা হয়েছিল, সেগুলি সে ফ্যানির কাছে খুলে বলেছিল। এখন আপনি নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছেন।"

লিসেন্‌ভগ্‌ মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলেন. তাঁর মনে হোল যেন মৃত যুবরাজের কণ্ঠস্বর রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কবর থেকে বেরিয়ে আসছে, যেন সে বলছে. "আমি তোমায় প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, কি কোরব আমার আয়ু শেষ হয়ে আসছে, বেশ বুঝতে পারছি। আমি জানি, আমার মৃত্যুর পর আরেকজন তরুণ তার প্রেম নিবেদন ক'রে তোমার কাছে এগিয়ে আসবে, তোমার বাহুবন্ধনের মধ্যে সে আনন্দলাভ কোরবে। কিন্তু কিছুতেই এ আনন্দকে সে ধরে রাখতে পারবে না। ক্লেয়ার, আমার অভিসম্পাত কি তুমি শুনতে পাচ্ছ ? আমি গত হোলে যে লোক ওষ্ঠ চুম্বন ক'রে তোমার দেহকে জড়িয়ে ধরবে, তাকে

নরকবাস ক'রতেই হবে। জান, মৃত লোকের অভিসম্পাতে স্বর্গের দেবতারাও সাড়া দেন? ক্লেয়ার, তাকে জানিয়ে দিও, তাকে পাগল হয়ে যেতে হবে; বিষাদে অবসন্ন হ'য়ে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।" তিনি যেন স্পষ্ট শুনলেন, ওল্‌সির মুখ থেকেই যেন মৃত যুবরাজের উক্তি বেরিয়ে এল।—আবার তাঁর মনে হোল, যেন সবুজ রংএর শালটা রেলিং থেকে বাগানে প'ড়ে যাচ্ছে।

জমিদার যেন আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়লেন, তাঁর সারা অঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে। মুখ থেকে তাঁর আর কোন কথাই বেরুলো না।

গানের মাষ্টারের ঘরে ক্লেয়ারের সঙ্গে প্রথম মধুর আলাপের দিনটির কথা, লিসেন্‌ভার্গের মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। আরও তাঁর মনে হোল, স্টেজের ওপর একটা সং দাঁড়িয়ে যেন বলছে "যুবরাজ অভিসম্পাত করেছিলেন, যে পুরুষ তাঁর প্রণয়ীর প্রতি আসক্ত হবে তার মৃত্যু অনিবার্য্য।" আবার যেন দেখলেন, স্টেজটা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দুটো অনন্ত নীল সমুদ্রে গিয়ে যেন মিশে যাচ্ছে। হঠাৎ চেয়ারের ওপর তাঁর দেহ এলিয়ে পোড়ল।

ওল্‌সি সাহায্যের জন্য চীৎকার ক'রে ওঠে। দুটি চাকর ছুটে এসে জ্ঞানহারা জমিদারকে ধ'রে একটা ইজিচেয়ারের ওপর শুইয়ে দেয়। একজন ডাক্তার আনতে ছুটে গেল, আরেকজন জল ও ভিনিগার নিয়ে এলো। ওল্‌সি জমিদারের কপালে অনেক মালিস কোরল, কিন্তু তাঁর কোন চেতনাই ফিরে এলো না। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে ব'ললেন "সব শেষ হ'য়ে গেছে।"

ওল্‌সি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে এইভাবে একখানা চিঠি লিখে ফেললো, "ক্লেয়ার আমি মোল্ডে গিয়ে তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। তোমার কাছে স্বীকার করছি, তোমায় আমি

আগে বিশ্বাস কোরতাম না; আমি ভেবেছিলাম তুমি আমায় প্রবঞ্চনা করবার চেষ্টা কোরছ। আমায় ক্ষমা কর; এখন তোমায় আর আমি অবিশ্বাস করি না। আমার নিমন্ত্রণেই লিসেন্‌ভগ্‌ এখানে এসেছিলেন। আমি একটা অদ্ভুত রকমের প্ল্যান খাটিয়েছিলাম, তাঁকে আমি মৃত যুবরাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ অসাড় হয়ে যায়, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।”

ওল্‌সি গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছিল; একটু পরে ঘরের মাঝখানে গিয়ে সে আনন্দচিত্তে হঠাৎ গান গাইতে সুরু ক’রে দিল। তার গলার স্বর ক্রমশঃ নিম্ন থেকে দ্রুত লয়ে গিয়ে ওঠে, ক্রমশঃ সেই সঙ্গীতের রাগিণীটা সমুদ্র গর্জ্জনের মত দিগন্তকে মুখরিত ক’রে তোলে। ওল্‌সির মুখে একটা শান্ত হাসির আভাস ফুটে ওঠে। আবার একবার তার পড়বার টেবিলে বসে অসমাপ্ত চিঠিখানা এইভাবে শেষ করে ফেলল, “প্রিয়তমে ক্লেয়ার আমাকে ক্ষমা কর; আবার আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে; বিরহিণী, ভেব না, আমি তিনদিনের মধ্যেই তোমার প্রেমের দেউলে গিয়ে উপস্থিত হব।”

পরিহাস

১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে নেপল্‌স সহরে জাহাজ থেকে মাল নামাবার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে খবরের কাগজগুলিতে অনেক ধরণের আজগুবি খবর বেরিয়েছিল। অন্যান্য সহযাত্রীর মত ঘটনাটির দিকে লক্ষ্য না ক'রে, ভীড় ও গোলমাল থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় ও সন্ধ্যাটা শান্তিতে কাটাবার জন্যে, আমি সমুদ্রতীরে নেবেছিলাম। দুর্ঘটনাটা কি ভাবে ঘটেছিল, আমি তা জানতাম। এই ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেল ; এখন মনে হয়, আমার মৌনতা ভঙ্গ ক'রে প্রকৃত ঘটনাটা খুলে বলি।

আমি মালয় ষ্টেটের মধ্যে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই সময়েই ব্যক্তিগত ব্যাপারে বাড়ী থেকে হঠাৎ একটা তার আসায় আমাকে সিঙ্গাপুর বন্দরস্থিত উটন্ নামক জাহাজে উঠতে হয়। জাহাজে যায়গার অভাব বোধ করেছিলাম। ইঞ্জিনের পাসেই ছিল আমার ছোট কেবিন, ভয়ানক গরম বোধ কোরতাম সেখানে। আলোও সেখানে তেমন প্রবেশ কোরতনা। ঘরটার মধ্যে বাতাস একেবারেই আসতনা, কাজেই আমাকে পাখাটা সব সময়েই চালিয়ে রাখতে হোত। নীচে থেকে সব সময়ই ইঞ্জিনের ঝক্ ঝকানি আওয়াজ এসে ঘরটাকে কাঁপিয়ে তুলতো, যেন মনে হোত, চব্বিশ ঘণ্টাই একজন কয়লাবাহী কুলি দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করছে। আবার জাহাজের উপরতলা থেকে পায়ের মস্ মসানি আওয়াজ সব সময়েই কানে এসে বাজে।

আমি মালপত্র ঘরের এককোণে গুছিয়ে রেখে, ওপরের ডেকে গেলাম। সেখানে দক্ষিণ বাতাস উপভোগ করে শরীর মন যেন জুড়িয়ে

যায়। এই জনতা পরিবৃত জাহাজের ডেকের ওপরেও ভীড় ও কোলাহল বড় কম ছিল না। আমার আশেপাশে মানুষে ভরে গিয়েছিল, তারা অনর্গল কথা বোলতে বোলতে ডেকের চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডেক চেয়ারগুলিতে শায়িত রমণীদের হাল্কা হাসি, লোক জনের অফুরন্ত চলা ফেরা আর কলরব আমার মনের মধ্যে কেমন একটি অস্বস্তির ভাব আনছিল। মালায়ায়, তার আগে বর্ম্মা এবং সায়াম প্রভৃতি অপরিচিত স্থানেও আমি গিয়েছি। স্মৃতির ছবিগুলি পর পর মাথার মধ্যে দিয়ে ঘুরে যায। অবসরের সময় আমি সেই স্মৃতিগুলি নিয়ে, চিন্তা ক'রে সাজিযে মনের পটে এঁকে রাখতে চেযেছিলাম। এই কোলাহল ও উত্তেজনা পূর্ণ স্থানে বিশ্রাম নে বার আর কোন উপায়ই ছিলনা। পড়তে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বইএর মধ্যে কোন রকমেই আমি মন বসাতে পারিনি।

তিনদিন ধরে অন্তরলোকে প্রবেশ ক'রে আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে, অনন্ত নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, সময় কাটাবার চেষ্টা করেছিলাম। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই দেখি অনন্ত নীল জল-রাশি, কেবল রাত্রে মাঝে মাঝে সমুদ্রের খানিকটা অংশ আলোয ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে। এইভাবে তিনদিন কেটে যায, যাত্রীদের কোলাহলের মধ্যে থেকে একটা অস্বস্তির ভাব মনে আনে। নিরুপায় হয়ে কামরার মধ্যে প্রবেশ করি। আমার দ্রুত পলায়নের কারণটা এই রকম,—সাংহাই থেকে আগত কযেকটী ইংরেজ তরুণী আহারের সময়ের আগে পর্য্যন্ত উৎকট সুরে নাচের গৎ বাজাচ্ছিল। নির্জ্জনতা, নীরবতাই হোল আমার কাম্য।

বিকেলের আহার শেষ করে, দু'বোতল বিয়ার চাপিয়ে ভাবলাম, নৈশ ভোজন ও নাচের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ কোরব। ঘড়ির কাঁটাকে

এইভাবে এড়িয়ে গিয়ে স্বপ্নলোকে বাস কোরব ভাবলাম। ঘুম ভাঙ্গতেই অনুভব কোরলাম, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে; ঘরটাও যেন বেশ গরম হয়ে উঠেছে। গা দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে ঘাম পড়ছিল। পাখাটা খুলে দিলাম। মনে হোল, সময়টা মধ্যরাত্রিই হবে, কারণ সঙ্গীতের ধ্বনি আর শোনা যাচ্ছিল না। মাথার ওপরে মনুষ্য চলাচলের শব্দও থেমে গিয়েছিল। শুধু যন্ত্র-দানবের হৃদ্‌কম্পন নৈশ স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছিল।

আমি কোনরকমে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ডেকে গিয়ে আবিষ্কার কোরলাম, সেখানে একটীও জনমানব নেই। প্রথমে আমার দৃষ্টি পোড়ল জাহাজের চোঙ্গাগুলির প্রতি, সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঊর্দ্ধে তারায় ভরা নীল আকাশে চোখ মেলে দিলাম। এমন অনন্ত, সুন্দর, আকাশ আগে কখনও দেখিনি। রাত্রির হাওয়ায় বেশ শীতলতার স্পর্শ অনুভব কোরছিলাম। দূরে দ্বীপগুলি থেকে হাওয়ার সঙ্গে সুগন্ধি ভেসে আসে। জাহাজে এই প্রথম, স্বপ্নের মত মধুরতার সঙ্গে বিরহিনী নারীর ন্যায় রাত্রির আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ডেকের ওপর শুয়ে অগণিত তারার ভাষা উপলব্ধি করতে মন চায়। ডেকে চেয়ারগুলি যাত্রীরা অধিকার করে বসেছিল। সেখানে এমন একটা নির্জ্জন স্থান চোখে পোড়ল না, যেখানে আমার মত ভাবুক প্রকৃতির লোকেরা বিশ্রাম-লাভ ক'রতে পারে। কি আর করি, চোখ মুদ্রিত ক'রে রাত্রের মাদকতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। আমার চিন্তা ও বোধশক্তির সূক্ষ্ম সূত্রগুলি ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা শুষ্ক কাশির আওয়াজে আমি চমকে উঠি। আবছা আলোয় একজোড়া চশমার কাঁচ আমার চোখে পড়ে। আমি লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে চলতি জার্ম্মাণ ভাষায় বোললাম ."আমাকে ক্ষমা

কোরবেন।” সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটী জার্ম্মাণ ভাষায় উত্তর দিলেন, “ক্ষমা করার কি আছে, বন্ধু?”

আমার মনে হোল, যে উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম তিনিও সেইভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কোরছেন। কালো ও ধূসর পট-ভূমিকার সামনে তাঁর ঝাপসা অবয়বটা ভেসে ওঠে। তাঁর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও জ্বলন্ত পাইপের মৃদু শব্দ আমার কানে এসে বাজে। এই স্তব্ধতা আমার কাছে অসহ্য ঠেকে। মনে হোল, এস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যাই। অস্বস্তি বোধ কোরছি, এমন সময় একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললাম। দীপ শলাকার মৃদু আলোর মাঝে আমাদের দৃষ্টির বিনিময় হয়ে যায়। ভদ্রলোকটীকে দেখে অপরিচিত বলেই মনে হোল। আমাদের মধ্যে কথা-বার্ত্তার কোন আদান-প্রদানই হোল না। এই দীর্ঘ মৌনতা কেমন একটা অস্বস্তি এনে দিচ্ছিল মনে। আমি আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম, “রাত্র প্রণাম।” একটা জড়ানো কর্কশ স্বরে জবাব এল, “নমস্কার।”

ভদ্রলোক খুব দ্রুতগতিতে বলে যেতে লাগলেন,—ক্ষমা কোরবেন, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, কোন একটা ব্যক্তিগত শোকের ব্যাপারে আমি অভিভূত হয়ে আছি, সেইজন্য এখানে কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় পর্য্যন্ত কোরতে পারিনি। আপনি যদি দয়া ক'রে এখানে আমার, অবস্থিতির সম্বন্ধে কারুকে না জানান, তা'হলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম,—এ অনুরোধ আমি নিশ্চয়ই রক্ষা কোরব। তাঁকে আবার জানালাম,—আমি একজন সাধারণ ভ্রমণকারী মাত্র, এখানে আমার কোনই পরিচিত লোক নেই।

• ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে, কেবিনের মধ্যে প্রবেশ কোরলাম। সে রাত্রে আমার সুনিদ্রা হোল না।

• সমুদ্রযাত্রার পথে ছোটখাট ঘটনা মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। এই বিশিষ্ট সহযাত্রীর প্রতি কেমন আমার একটা আকর্ষণ আসে। সমস্ত দিন একটা অধৈর্য্যের ভাব নিয়ে আমার সময় কেটে যায়; রাত্রে আবার সেই ভদ্রলোকটীকে দেখবার জন্যে মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। দিনটা খুবই দীর্ঘ বলে মনে হ'তে থাকে। বিলম্ব না ক'রে শুয়ে পোড়লাম। গত রাত্রের মত ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রেডিয়াম লাগান ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠিক দু'টো বেজেছে। তাড়াতাড়ি ডেকের দিকে গেলাম।

গত রাত্রের মত আজকের রাত্রিটাও ছিল গভীর। অগণিত তারায় সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা অনুভব করাতে, ডেকের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আমি জানতে চাইছিলাম যে সেই রহস্যজনক আগন্তুকটী সেই জড়ান দড়ির ধারে আবার একা বসে আছেন কিনা। যায়গাটীর কাছে অগ্রসর হোতেই সেই পাইপের লাল আভাটা আবার চোখে পোড়ল। দেখলাম, ভদ্রলোক ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানেই বসে আছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও থেমে গেলাম, ভাবলাম সরে পড়ি, এমন সময় ভদ্রলোক আমার কাছে এগিয়ে এসে বিনীতস্বরে বোললেন,—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনি এত কাছে এসে আমায় দেখে ফিরে যাচ্ছিলেন, আসুন, আমার কাছে বসুন। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো আপনাকে বিরক্ত কোরব, এই ভেবেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি একটু দুঃখ-জড়িত স্বরে বোললেন—আপনার উপস্থিতিতে বিরক্ত হওয়া দূরের কথা, আনন্দলাভই আমার খুব হবে।

অনেকদিনই আমার এইভাবে একা একাই কেটেছে, কারুর সঙ্গে

প্রাণ খুলে একটা কথা পর্য্যন্ত বোলতে পাইনি; মৌন হয়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। কয়েদীর মত কেবিনের মধ্যে একা আর বন্দী হয়ে থাকতে পারি না। সাধারণ যাত্রীদের কলরব ও হাসি আর সহ্য হয় না। তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে বোললেন—আমি হয়তো অনর্গল কথা বলে আপনাকে কষ্ট দেব। কথা শেষ ক'রে তিনি উঠতে উদ্যত হোলে, আমি তাঁকে বসতে অনুরোধ ক'রে বোললাম—আপনার সঙ্গলাভ ক'রে কষ্ট পাওয়া ত দূরের কথা, এই তারায় ভরা আকাশের তলায় আপনার সঙ্গে মধুর বাক্যালাপ ক'রে কতই না আনন্দলাভ কোরব। আসুন, একটা সিগারেট ধরান। দেশলাইএর আলোয় সেই পরিচিত মুখখানি আরেক বার দেখে নিলাম।

ভদ্রলোকটির মুখ দেখে মনে হোল, তিনি যেন একটা গল্প বোলতে উৎসুক। আমরা দুজনেই জড়ান দড়ীর কুণ্ডলীর পাশে বসেছিলাম। ভদ্রলোক হঠাৎ মৌনতা ভঙ্গ ক'রে বলে উঠলেন—আপনি কি পরিশ্রান্ত?

আমি উত্তর কোরলাম—না তো।

তিনি সোজাসুজিভাবে বললেন—আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।

শরীরে একটু ঝাঁকানি দিয়ে, তিনি পরিষ্কার ভাষায় সুরু কোরলেন—আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি হোলাম একজন ডাক্তার, ধরুন ঘটনাটা আমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘিরে আছে। আমার এই উত্তেজনা দেখে আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না। মদ খেয়েছি বোলেই যে আমি এত চঞ্চল হয়েছি, তা ভাববেন না। এটা খুবই সত্যি কথা যে জাহাজের ওপর আমি ইচ্ছে ক'রেই একটু বেশি মাত্রায় মদ খেয়েচি।

প্রাচ্যে আমার এই একঘেয়ে জীবনে মদ খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভেবে দেখুন, আমাকে সাত বছর এই দেশের লোক ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে, এ অবস্থায় মাথা ঠিক

করে ভদ্রভাবে চলা অসম্ভব। যদি এই সুদীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে কোন দেশবাসীকে সামনে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা না বলে কি কেউ থাকতে পারে ?

তিনি আবার হঠাৎ অন্ধকারে কি যেন হাতড়াতে লাগলেন, মনে হোল। একটা ঠুন্‌কো আওয়াজ পেলাম, যেন মনে হোল দু'টো মদের বোতল তাঁর পাশে রয়েছে। বোতল থেকে তিনি খাঁটি এক পেগ্‌ হুইস্কী ঢেলে আমায় বোললেন—একটু খাবেন না ?

আমি চুমুক দিয়ে কিছুটা খেলাম। গ্লাসের অভাবে তিনি বোতলে মুখ দিয়ে বেশ কিছুটা মদ খেয়ে নিলেন।

ঘড়িতে আড়াইটে বেজে উঠল। তিনি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে আরম্ভ কোরলেন—

আমি আপনাকে ঘটনাটা হুবহু প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পরিস্কারভাবে বলে যাব। এর মধ্যে কোন লজ্জা ও লুকোচুরি নেই। রুগীরা আমার কাছে চিকিৎসার পরামর্শ নিতে আসত ; গোপনীয় কোন ব্যায়রামের জন্যে তাদের অনাবৃত দেহের কোন বিশিষ্ট স্থান আমায় পরীক্ষা ক'রে দেখতে হোত। এই সব ভয়ঙ্কর স্থানে আমি সূক্ষ্ম রুচিবোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রাচ্যের রহস্য ও মন্দিরের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু সময় সময় জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, শরীরের সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন খেতে পারেন বটে, কিন্তু এই ধরণের জ্বরে শরীর একেবারে ভেঙ্গে যায়, মানুষকে একেবারে অকেজো করে তোলে। যদি কোন ইউরোপীয় ভদ্রলোককে বড় সহর থেকে মফঃস্বলে যেতে হয়, তা'হলে তাঁকে মনের সুস্থতা অচিরেই হারিয়ে ফেলতে হয় ; এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কেউ কেউ মদ খাওয়া অভ্যাস করেন। ঘরের জন্য কারুর মন কেঁদে ওঠে। বছরের পর বছর

বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি এইভাবে কেটে যায়। তাঁর মনে হোতে থাকে, বাড়ী ফিরেই বা লাভ কি, কেই বা তাঁকে চিনবে, অথবা তাঁকে অভ্যর্থনা কোরবে?

আমি জার্ম্মাণীতে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলাম; ডাক্তারী পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই লিপ্‌জিগের ক্লিনিকে একটা চাকরী পাই। আমার নাম ও পসার ধীরে ধীরে জমে উঠলো, এমন সময় একটা প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে আমার ভবিষ্যৎ একেবারে মাটী হয়ে যায়। হাঁসপাতালে একটি নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই নারীটি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়, ভদ্রলোকটিকে সে পাগল করে দিযেছিল, মাথা ঠিক রাখতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত কোরতে চেষ্টা করেছিলেন।

আমার অবস্থাও সেই ভদ্রলোকের মত দাঁড়িয়েছিল। যে সব নির্লজ্জ নারী পুরুষের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে, আমি তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার না ক'রে পারি না। এই ধরণের এক নারীর কাছে আমি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হয়ে পড়েছিলাম। সে আমায় যখন যা হুকুম কোরত, আমি তা'ই পালন ক'রে যেতাম। তার জন্যই আমি একবার হাঁসপাতালের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করেছিলাম। আমার এই চুরির ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে। সে যাত্রায় আমার এক কাকার দয়ায় বেঁচে যাই, তিনিই আমার টাকাটা পরিশোধ করে দেন।

লিপ্‌জিগে আমার আর কোন চাকরিই জুটল না। ঠিক এই সময়েই খবর পেলাম যে ডাচ গভর্ণমেণ্ট তাঁদের উপনিবেশের জন্য কয়েকজন ডাক্তার চান। দরখাস্ত করতেই একটা চাকরী জুটে গেল। দশ বৎসরের চুক্তিতে সই ক'রে আগেই অনেক টাকা পেয়ে গেলাম। টাকার অর্দ্ধেক অংশ কাকাকে দিলাম, বাকীটা সহরের একটি তরুণীর হাতে

সমর্পণ কোরলাম। আমি এইভাবে অর্থহীন হ'য়ে ইউরোপ থেকে পাড়ি দিলাম। আপনি যেভাবে এখন বসে আছেন আমিও তখন ওইভাবে বসেছিলাম। আমার এই নির্জ্জন দিনগুলি একে একে কেটে গেল।

ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট ব্যাটেভিয়া অথবা অন্য কোন শ্বেতকায় নরনারী পরিবৃত বড় সহরে না পাঠিয়ে একটা ছোট যায়গায় আমার কর্ম্মস্থল নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন। কয়েকজন বেরসিক রাজকর্ম্মচারীকে নিয়ে ছিল সেখানকার সমাজ; আবার সেখানে একটা দো-আঁসলা জাতের বাসও ছিল। ক্রমশঃ যায়গাটা গা-সওয়া হয়ে এসেছিল। পড়াশুনার সময় খুব অল্পই পেতাম। ক্রমশঃ যায়গাটীর জলহাওয়া সহ্য হয়ে এলো।

উপনিবেশের শ্বেতকায় লোকগুলির সংস্পর্শে আমি হাঁফিয়ে উঠতাম। ভাল না লাগাতে তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম আর অবসরের সময় চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতাম। আমার কাজের সময় সম্পূর্ণ হতে আর দু'বছর মাত্র বাকী ছিল। এর পর অবসর গ্রহণ ক'রে স্বচ্ছন্দে ইউরোপে গিয়ে নতুনভাবে জীবনযাপন কোরতে পারতাম; অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

এর মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

অন্ধকারের স্তব্ধতা হঠাৎ ভঙ্গ হোল; রাত্রি এত নিস্তব্ধ ছিল যে জাহাজের চাকার আওয়াজটা আমি পরিস্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হোল, একটা সিগারেট ধরালে মন্দ হয় না, কিন্তু আমার আশঙ্কা হোল যে সামান্য শব্দে ও আলোর ঝলকে তিনি চমকে উঠতে পারেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, তিনি কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন?

এই রকম চিন্তা করছি, এমন সময় দু'বার ঘণ্টা বেজে উঠলো। তখন তিনটে বেজে গিয়েছে।

তিনি হঠাৎ নড়ে উঠলেন, মনে হোল হাতে করে তিনি একটা হুইস্কির

বোতল তুলছেন। আবার তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে যেতে লাগলেন—

আমি আমার অপ্রিয় কর্ম্মস্থলে জালের মধ্যে মাকড়সার মত আটকে গেলাম। সময় যেন কাটে না, বর্ষা শেষ হয়ে এল, এক সপ্তাহ ধরে ছাতের ওপর অবিরাম বৃষ্টিপতনের শব্দ অনুভব করেছিলাম। একটীও জনপ্রাণী অথবা কোন ইউরোপীয় ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে একবারের জন্যেও পদার্পণ করেননি। বাড়ীতে দেশীয় চাকর ও হুইস্কির বোতলই ছিল আমার সাথী।

নভেলের মধ্যে যখন আলোকমালায় শোভিত রাস্তার সারি ও ইউরোপীয় সুন্দরীদের কথা পোড়তাম তখনই দেশের জন্য মনটা কেঁদে উঠত। তিনি আবার আমাকে বোললেন—আপনি হলেন ভূপর্য্যটক। ওই সব দেশে লোকের অবস্থা যে কিরকম হয়, আপনার তা জানা নেই। শ্বেতকায় ভদ্রলোকেরা কোননা কোন দেশীয় ব্যায়রামে ভুগে থাকেন। সময় সময় তাঁদের গৃহে ফেরার জন্য মন এত কাতর হয়ে ওঠে, যে তাঁরা ভুল বকতেও আরম্ভ করেন। এই রকম একটা বেদনা মনে অনুভূত হচ্ছিল, এমন সময় টেবিলে ম্যাপ ছড়িয়ে আমার গন্তব্য স্থানগুলির কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার চাকর দুটি ছুটে এসে জানাল যে একজন ইউরোপীয় মহিলা আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চান। কথাটা শুনে আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলাম। ঘোড়ার গাড়ী অথবা মোটারের কোন আওয়াজই আমার কাণে এলনা। মনে প্রশ্ন এলো, হঠাৎ এই নির্জ্জন স্থানে ইউরোপীয় মহিলাটীর আসার কারণ কি হোতে পারে?

আমি তখন দোতলার সংলগ্ন বারান্দার ওপর বসেছিলাম। দু'এক মিনিটের মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে, নিজেকে একটু সংযত করে নিলাম। নীচে নামবার সময় একটা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অনুভব কোরছিলাম।

ভাবলাম, এ মহিলাটী কে হোতে পারে? এই জনবিরল স্থানে শ্বেতাঙ্গিনীর আসার মধ্যে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

মহিলাটী ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসেছিলেন, পিছনে একটি চীনা বালক দাঁড়িয়েছিল, মনে হোল তাঁর চাকর হয়ত হবে। তিনি লাফিয়ে উঠে আমায় অভ্যর্থনা ক'রার সময় লক্ষ্য কোরলাম, তাঁর মুখটি ওড়না দিয়ে ঢাকা। আমাকে কথা বলতে না দিয়ে তিনি ইংরেজী ভাষায় আরম্ভ কোরলেন—ডাক্তার নমস্কার, আপনার সঙ্গে আগে থেকে কোন ব্যবস্থা না ক'রে আসার জন্য আমায় ক্ষমা কোরবেন। তিনি আবার দ্রুতগতিতে বলে চললেন—এই বসতির পাশ দিয়ে মোটারে ক'রে যাবার সময়, আমার মনে পড়ে গেল, আপনি এখানে বাস করেন। আপনার প্রশংসা অনেকের কাছে শুনেছি। এদেশে আপনাকে চেনে না এমন কোন লোক নেই। আপনি সহরে কেন আসেন না? এখানে আপনার যোগীর মত জীবন-যাপনের কারণটা কি বল্‌তে পারেন?

মহিলাটী আমায় উত্তর দিতে সুযোগ না দিয়ে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন। তাঁর দেহের অঙ্গ-ভঙ্গিমার মধ্যে থেকে একটা স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। ভাবলাম, তাঁর এই কথার পর কথা বলে যাওয়ার কারণটা কি হতে পারে? মহিলাটী পরিচয় গোপন ক'রছেন কেন, এই ভেবে আশ্চর্য্যান্বিত হোলাম। ভাবলাম তাঁর কি কোন অসুখ করেছে, আবার মনে হোল তিনি কি তাহলে উন্মাদিনী?

ক্রমশঃ আমি অন্যমনস্ক হয়ে পোড়লাম, মহিলাটী কিন্তু বাক্যবাণে আমায় অস্থির ক'রে তুললেন। তাঁর কথা শেষ হতে অভ্যর্থনা ক'রে ওপরে নিয়ে গেলাম। আমার বসবার ঘরের চারিপাশে চোখ বুলিয়ে তিনি আরম্ভ কোরলেন—এখানকার বাড়ীগুলো কি সুন্দর; আপনার বই-গুলোও কি চমৎকার, মনে হয় সবক'টাই পড়ে শেষ করে ফেলি।

মহিলাটী বইএর সেল্‌ফের কাছে গিয়ে বইএর নামগুলি লক্ষ্য ক'রতে লাগলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলাম—আপনাকে কি এক পেয়ালা চা দিতে পারি ?

প্রত্যুত্তরে তিনি বোললেন—ধন্যবাদ, আমার হাতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে। দেখুন, আপনার বইগুলি দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ফরাসী ভাষায় খুব অভিজ্ঞ, না ? আমাদের যে ডাক্তার, তিনি ব্রিজ খেলতেই ওস্তাদ, আর কিছুই না। এই বসতির মধ্য দিয়ে মোটারে ক'রে চলেছি এমন সময় আমার হঠাৎ মনে হোল আপনার কাছ থেকে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে মত গ্রহণ করি।

এই কথাগুলি তিনি বই দেখতে দেখতে আমার দিকে না তাকিয়ে বলে গেলেন। একটু থেমেই আবার তিনি সুরু কোরলেন,—আপনি এখন অসম্ভব রকম ব্যস্ত, না ? যাক, আরেকদিন আপনার কাছে আসব। আমি তাঁকে বোললাম,—আমার দরজা সব সময়ই খোলা, যখনই আপনার কোন সাহায্যের দরকার হবে তখনই কোন দ্বিধা না করে আমার কাছে চলে আসবেন।

মহিলাটী একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত না করে সেল্‌ফ থেকে বই নিয়ে পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বলতে লাগলেন, "আমার অসুখটা এমন কিছু শক্ত নয়, মেয়েরা প্রায়ই যে সব কষ্টে ভোগে, আমার কেস্‌টাও প্রায় সেই ধরণের, যেমন ঘন ঘন মাথা ধরা, ফিট হয়ে পড়া, গা বমি বমি করা, এ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ সকালেই মোটারে করে যাবার সময় এক যায়গায় মোড় ঘোরবার সময় হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি, চাকরটা আমায় ধরে ফেলেছিল, না হ'লে নীচে পড়ে যেতাম। খানিকটা জল খাবার পর আমি কিছুটা সুস্থ বোধ

কোঁরলাম। ডাক্তার, এ থেকে কি আপনার মনে হয় না যে সোফার অসম্ভব জোরে গাড়ী চালিয়েছিল ?”

আমি বোললাম, “আপনার প্রশ্নের হঠাৎ জবাব দিতে পারি না। আমাকে খুলে বলুন তো, এই রকম ফিট কি আপনার প্রায়ই হয়ে থাকে ?”

মহিলা—এর মধ্যে হয়নি ; কিন্তু গত সপ্তাহে কয়েকবার হয়েছিল। আজকাল সকালে খুব দুর্ব্বলতা অনুভব করি।

কথা বোলতে বোলতে মহিলাটী আবার বই-এর আলমারীর দিকে গিয়ে একখানা বই টেনে বার করে আপনার মনে পাতা উল্‌টে যেতে লাগলেন। তাঁর চলার মধ্যে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য কোরলাম। আমি ইচ্ছা কোরেই কোন জবাব দিলাম না। তাঁর এই অবস্থিতি আমার বেশ ভালই লাগছিল।

মহিলাটী হঠাৎ হাল্কাভাবে বলে উঠলেন, “ডাক্তার আপনার মত আছে ? ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, দেশীয় কোন শক্ত ব্যায়রামে যে ভুগছি, তা ভাববেন না ; কোন ভয়ের কারণ নেই।”

উত্তরে বোললাম, “আমি আপনাকে প্রথমে পরীক্ষা ক’রে দেখবো, জ্বর আছে কিনা ; এগিয়ে আসুন, দেখি আপনার নাড়ীটা।”

আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে তিনি সরে দাঁড়িয়ে বোললেন, “না, ডাক্তার না, আমার জ্বর মোটেই হয়নি ; ফিট হবার পর থেকে প্রত্যেক দিনই টেম্পারেচার নিয়ে দেখেছি জ্বরের কোন লক্ষণই নেই ; হজমও আমার বেশ ভালই হচ্ছে।”

মহিলাটীর আচরণে কেমন যেন একটু সন্দেহ লাগলো। মনে হোল, তিনি যেন কি বোলতে চাচ্ছেন অথচ বোলতে পারছেন না। ভাবলাম, এই যে দীর্ঘ দু’শো মাইল পথ মোটারে করে এখানে তিনি এসেছেন,

নিশ্চয়ই ফ্লবার্টের সাহিত্য নিয়ে আলোচনার জন্য নয়। মৌনতা ভঙ্গ করে বোললাম, "মাপ কোরবেন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন কোরতে পারি কি ?"

প্রত্যুত্তরে মহিলাটী বোললেন, "নিশ্চয়ই, ডাক্তারের কাছে আমার তো ওই উদ্দেশ্যেই আসা।" আবার পেছন ফিরে মহিলাটী বই নিয়ে নাড়াচাড়া কোরতে লাগলেন। আমি প্রশ্ন কোরলাম, "আপনার কোন ছেলেপিলে আছে কি ?"

মহিলাটী উত্তরে বোললেন, "আমার একটীমাত্র ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম, "আপনি যখন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হন তখন কি এই রকম সব লক্ষণ অনুভব করেছিলেন ?"

মহিলাটী বোললেন, "হ্যাঁ।" এবারের উত্তরের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য কোরলাম।

আমি বোললাম, "তা'হলে আমি যা অনুমান করেছি তা ঠিকই, কি বলুন ?"

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটী জবাব দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাশের ঘরে আসতে অনুরোধ কোরলাম। মহিলাটী আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বোললেন, "পরীক্ষার কোনই প্রয়োজন নেই; আমার কি অবস্থা হয়েছে, বেশ উপলব্ধি ক'রতে পারছি।"

আর এক পেগ মদ চড়িয়ে নিযে আমাকে সম্বোধন ক'রে ভদ্রলোক বোললেন,—ভেবে দেখুন, সেই জনবিরল স্থানে একা একাই আমার দিন কাটছিল; নিঃসঙ্গ জীবনে মোটেই শান্তি পাচ্ছিলাম না, এমন সময় ওই মহিলাটী আমার ওখানে উদয় হোলেন। অনেক বছর পরে এই প্রথম একজন শ্বেতাঙ্গিনী নারীকে দেখলাম। মহিলাটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ

কোরতে মনে কেমন একটা আতঙ্কের স্বষ্টি হোল। প্রথমে মনে হোল, তিনি আমার কাছে খোস গল্প কোরতে এসেছেন ; কিন্তু এর একটু পরেই তিনি এমন একটা দাবী করে বোসলেন যে মনে হোল একটা তীক্ষ্ণ ছোরার ফলকে আমাকে বিদ্ধ কোরতে তিনি যেন উদ্যত হয়েছেন। তিনি আমার কাছে কি ধরণের সাহায্য আশা করেছিলেন তা আমার বুঝতে বিলম্ব হোল না। এই প্রথম নয়, এর আগে বহু নারী এই ধরণের দাবী নিয়ে আমার কাছে এসেছিল ; তারা অশ্রুসিক্ত নয়নে বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় আমার কাছে এসেছিল। এই শেষোক্ত নারীটীর ধরণ ছিল অন্য রকমের, মনে হয়েছিল যে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি আমার কাছে এসেছেন। অনুভব কোরলাম যে তেজস্বীতার দিক থেকে নারীটী আমাকে অতিক্রম করে যান ; তিনি আমাকে দিয়ে ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতেও পারেন। আমার মনের মধ্যেও একটা পাপের ছায়া ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় মনটা হঠাৎ তিক্ততায় ভরে উঠলো। মহিলাটীর প্রতি কেমন যেন একটা বিদ্রোহের ভাব আমার মনে জেগে উঠলো। মনে হোল তিনি যেন আমার শত্রু। কিছুক্ষণের জন্য নিঃস্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে রইলাম। মনে হোল, তিনি যেন ওড়নার মধ্য থেকে আজ্ঞাসূচক নেত্রে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি কিন্তু তাঁর আজ্ঞা মেনে চলতে রাজি হইনি ; কোন জবাব না দিয়ে আমি এমন ভাণ কোরলাম, যেন তাঁর কোন কথাই আমি বুঝতে পারিনি।

তাঁর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা ক'রে বোললাম, "চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই ; আর জানালাম যে এই ধরণের ফিট গর্ভের প্রথম দিকে হয়েই থাকে।"

মহিলাটী আমার কথায় বাধা দিয়ে আবার বলে উঠলেন "হৃদযন্ত্রই শুধু আমায় কষ্ট দিচ্ছে, এ ছাড়া কোন উপসর্গই নেই।"

আমি বোললাম, "আপনার শুধুই হৃদ্‌যন্ত্রের কষ্ট, না?" কথা বোলতে বোলতে আমি ষ্টেথিস্‌কোপটার দিকে যেই হাত বাড়িয়েছি অমনি তিনি বাধা দিয়ে বোললেন, "বিশ্বাস করুন, আমার শুধু হৃদযন্ত্রেরই কষ্ট হচ্ছে; অযথা পরীক্ষা করিয়ে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট কোরতে চাইনা। আমার একান্ত অনুরোধ যে আমি যা বলছি আপনি তা বিশ্বাস করুন। সত্যি করে বলছি, আমি আপনার ওপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি।"

প্রত্যুত্তরে আমি বোললাম, "অনুগ্রহ করে আমার কাছে সব কথা খুলে বলুন। সবার আগে আপনার মুখের ওড়নাটা খুলে ফেলে বসুন। ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে আসার সময় কেউ এইভাবে মুখে ওড়না ঢাকা দেয় না।"

আমার সামনে বসে তিনি মুখ থেকে ওড়নাটা সরিয়ে দিলেন। মহিলাটী ছিলেন জাতিতে ইংরাজ; তাঁর পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছলতা আমার চোখে পড়ছিল। পুরো এক মিনিট ধরে আমরা দু'জনেই পরস্পরের প্রতি চেয়ে রইলাম।

মহিলাটীর মধ্যে আগের মতই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। তিনি কম্পিতস্বরে বোললেন, "ডাক্তার, আমি আপনার কাছে কি সাহায্য চাই বুঝতে পারছেন, না বুঝতে পারছেন না?"

উত্তরে আমি বোললাম, "হ্যাঁ, আমি অনুমান করেছি আপনি কি চান। আমাদের ভেতর খোলাখুলি ভাবে কথা হয়ে যাওয়াই ভাল। আপনি চান যে আপনার এই মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়া ও গা বমি বমি ভাব থেকে নিষ্কৃতির একটা উপায় করে দিই। তাই নয় কি?

মহিলাটী উত্তরে বোললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন।

আমি বোললাম, "জানেন, এতে আমাদের দুজনেরই বিপদে পড়ে

যাবার সম্ভাবনা আছে ; এই ব্যাপারে এখানে অস্ত্রোপচার করাটা বে-আইনী হবে, এ ধারণা বোধ হয় আপনার নেই ?”

মহিলাটী উত্তর কোরলেন, “আমি জানি, এমন অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তারী শাস্ত্রে এ ধরণের অস্ত্রোপচারকে অবৈধ না ব'লে বৈধই বলা হয়ে থাকে।”

আমি বোললাম,—অবশ্য প্রয়োজন মনে ক'রলে এ ধরণের অস্ত্রোপচার ডাক্তারেরা করে থাকেন।

মহিলাটী বোললেন,—আপনি ডাক্তার, অস্ত্রোপচার করা না করা আপনারই হাতে।

মহিলাটীর চোখ দেখে মনে হোল, তিনি যেন আমায় এ কাজটা কোরতে আজ্ঞা করছেন। তাঁর তেজের সামনে নিজেকে খুব দুর্ব্বল অনুভব কোরলাম। প্রতিজ্ঞা কোরলাম, তাঁর করায়ত্বের মধ্যে কিছুতেই যাব না। একটু ভেবে বোললাম, “অন্য ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করে এ দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে সাহস হচ্ছে না।”

মহিলাটী বোললেন,—অন্য ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিয়ে লাভ কি ? আমি তো শুধু আপনারই মতামত চাই।

আমি বোললাম,—আমার কাছে কেন ?

মহিলাটী শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিলেন,—ভাবলাম, আপনি লোকালয়ের বাইরে থাকেন, আর আমার পরিচয়ও আপনি একেবারে জানেন না, আপনার হাতযশের কথা শুনেছি, এই ভেবেই আপনার শরণাপন্ন হোলাম। ধরুন, এই সাহায্যের জন্য আপনাকে যদি প্রচুর অর্থ দিই তা'হলে বোধ করি, অনায়াসেই একাজে হাত দিতে পারেন ?

আমার শরীরের ভেতর বেশ একটা কম্পন অনুভব কোরলাম। ভাবলাম, অস্ত্রোপচারের বিনিময়ে এতোগুলো টাকা পাব ; আবার মনে

হোল, নারীটী আমাকে বশ করবার চেষ্টা করছে। একটু বিদ্রূপের সঙ্গে বোললাম, "এতগুলো টাকা আপনি আমায় দেবেন?"

মহিলাটী বোললেন,—টাকাটা দেবো, এই সর্ত্তে যে প্রথমতঃ আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী হবেন, আর দ্বিতীয়তঃ আপনি এই ডাচ্ উপনিবেশ পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে যাবেন।

আমি উত্তর কোরলাম,—আপনি জানেন, এতে আমার পেন্‌সন্ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে?

মহিলাটী উত্তর দিলেন,—আপনাকে যা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেব, তা আপনার পেন্‌সনের টাকাকেও ছাপিয়ে যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম,—কত টাকা আপনি দিতে পারেন?

মহিলাটী উত্তর দিলেন,—আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে দেবো।

আমি ভয়ে ও রাগে কেঁপে উঠলাম। ভাবলাম, মহিলাটী টাকার বিনিময়ে আমায় কিনে ফেলে ডাচ্ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে চুক্তিটা নষ্ট করে দিতে চান। মনে হোল, নারীটী আমায় যেন বশীভূত কোরতে চলেছেন; রাগে আমার অন্তরটা জ্বলে উঠলো। অন্তর্দাহ নিয়ে যেই উঠে পড়েছি, এমন সময় তাঁর গর্ব্বিত চোখ দুটীর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়াতে একটা আসুরিক প্রবৃত্তি আমার মনের মধ্যে জেগে উঠলো—কামার্ত্ত বেদনায় সারা শরীরে রোমাঞ্চ অনুভব কোরলাম। এরপর নারীটীর প্রতি আমার একটা ঘৃণার উদ্রেক হোল। মনে হোল, যেন একটা বিষাক্ত সাপ আমাকে দংশন করে সারা শরীর জ্বলিয়ে দিচ্ছে। কোন দ্বিধা না ক'রে তাঁকে বলে ফেললাম—আমি আপনাকে এখন বলে যাব, কখন কি ভাবে আমার মধ্যে এই উন্মত্ত ভাব এসেছিল।

ভদ্রলোকটী থেমে গিয়ে বোললেন, "মদ, মদ, আর একটু মদ চাই।

পেয়ালাটায় একটা বড় রকমের চুমুক দিয়ে তিনি জোর গলায় আবার আরম্ভ কোরলেন—

বন্ধু, আশা করি আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি যে একটা মহৎ লোক তা নয়, কিন্তু সব সময়ই আমি সাগায্যপ্রার্থী নরনারীর উপকারই করে এসেছি। আমি যে কুৎসিৎ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস কোরতাম, সেখানে ভগ্ন স্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল নরনারীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করাই আমার ধর্ম্ম মনে কোরতাম। মানুষের মধ্যে যখন কার্য্যকরী শক্তির লীলা চলে, তখন মনে হয়, এ দেহ তো তাঁরই আধার। কি জানি, কেন এই মহিলাটীর প্রথম দর্শনে আমার মনে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম। তাঁর আচরণে, কেন জানি না, আমার ঘুমন্ত পশুপ্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। আমি তাঁর কথাবার্ত্তা থেকে অনুমান কোরলাম, নারীটী তিন-মাস আগে একদিন হঠাৎ এত কামার্ত্ত হয়ে পড়েছিল যে সেই দুর্ব্বল মূহূর্ত্তেই গর্ভস্থিত এই অবৈধ সন্তানের পিতাকে দেহ দান করে ফেলেছিল। এই কলঙ্ক যাতে না বেরিয়ে পড়ে সেইজন্যই তিনি আমার শরণাপন্ন হন।

এর পূর্ব্বে কখনও আমার পেশাদারী ব্যবসার সুযোগ নিয়ে এ ধরণের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়িনি। ঠিক যৌন প্রবৃত্তির তাড়নায় আমি যে নারীটীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলাম তা নয়; আমার পুরুষকার দিয়ে এই গর্ব্বিত নারীটীর ওপর প্রাধান্য লাভ কোরব, এই ছিল আমার একান্ত কামনা। সত্যি বোলতে কি, এই সতেরো বছরের মধ্যে কোন শ্বেতাঙ্গিনী নারীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ আমার একবারও আসেনি; প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে এ ধরণের বাধা আমি কখনো পাইনি। দেশী তরুণীরা শ্বেতকায় পুরুষদের ভয় ও ভক্তি ক'রে থাকে, সামান্য চেষ্টাতেই তারা বশীভূত হ'য়ে পড়ে। এই গর্ব্বিতা রহস্যময়ী নারীটীর প্রথম দর্শনেই আমি বেশ বিচলিত

হ'য়ে উঠেছিলাম ; আমি চেয়েছিলাম, গর্ব্বিতা দর্পভরে আমার ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত আদিম মানুষের বংশধরের ঘরে চলে আসুক।

এই ধরণের চিন্তার রাশি আমার মাথার মধ্যে জট পাকাতে সুরু কোরল। অনাসক্তের মত ভাণ করে তাকে বোললাম, "সামান্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আমি ওকাজে হাত দেব না।"

আমার দিকে চেয়ে মহিলাটী হতাশার সুরে বোললেন, "তাহলে আপনি কত দক্ষিণা চান, শুনি ?"

উত্তরে আমি বোললাম—"আমায় অভাবগ্রস্থ ক্ষুদ্র ব্যবসাদার প্রকৃতির লোক ঠাওরাবেন না, যদি ওই ধরণের লোক আমাকে ভেবে থাকেন, তা'হলে কোন সাহায্য আশা করাই আপনার ধৃষ্টতা হবে। টাকার বিনিময়ে একাজ আমার কাছে আশা কোরবেন না।"

মহিলাটী জিজ্ঞাসা কোরলেন, "তাছাড়া আপনি আমার কাছে কি আশা করেন ?"

আমি গলা এক পর্দ্দা চড়িয়ে উত্তর দিলাম—আমার কাছে কেউ টাকার গর্ব্ব দেখিয়ে সাহায্য নিতে আসবে, আর আমি তাতে রাজি হব, সে প্রকৃতির মানুষ যদি আমায় ভেবে থাকেন, তা'হলে মস্ত ভুল করেছেন। আমার কাছে যে বিনীত ভাবে প্রার্থনা নিয়ে এগিয়ে আসে, তাকেই আমি শুধু সাহায্য ক'রে থাকি।

মহিলাটী উত্তর কোরলেন, "আপনার কাছে তা'হলে কি করযোড়ে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা কোরতে হবে ?"

আমি বোললাম, "তাই কোরতে হবে আপনাকে।"

দর্পভরে মাথা নেড়ে তিনি বোললেন, "ওইভাবে আপনার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ! তা হতেই পারেনা ! এর চেয়ে আমার কাছে মৃত্যুও শ্রেয়।"

আমি সাহস ক'রে বলে ফেললাম, "বুঝতে পেরেছেন তো, কি চেয়েছি ? আমার দাবী মিটলেই, আপনাকে সাহায্য কোরব।"

মহিলাটী আমার দিকে কট্‌মট ক'রে তাকিয়ে, একটা বিদ্রূপের হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিলেন। ভাবলাম, তাঁর কাছে নিজেকে খুব ছোট ক'রে ফেললাম। হাসির রেশটা একটা বজ্রনাদের মত আমার কাণে গিয়ে ঠেকলো। মাথাটাও যেন একটু ঘুরে গেল। ভাবলাম, নতজানু হ'য়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভগ্ন হৃদয়ে বোললাম, "আমার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা করুন।"

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আজ্ঞাসূচক স্বরে বলে উঠলেন —"আমাকে অনুসরণ কোরলে আপনাকে পরে অনুশোচনা কোরতে হবে, জানবেন।"

কথাটী শেষ ক'রে নিমেষের মধ্যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মনের মধ্যে তাঁকে অনুসরণ করার বাসনা প্রবল হ'য়ে উঠলো। কেন জানি না, আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল, তাঁকে ধরে এনে বেশ ভাল ক'রে দু'ঘা দিয়ে গলাটা চেপে ধরি।

আস্তে আস্তে আমার এই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে ঘর থেকে বাইক্‌টা বার ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে চালিয়ে গেলাম ; ভাবলাম, যদি তাঁকে কোনমতে ধরে ফেলতে পারি। মনে হোল, মোটারে ওঠার আগেই তাঁকে ধরে ফেলবো। জঙ্গলের ধারে রাস্তার বাঁকে, তাঁকে আবিষ্কার ক'রে দেখলাম, তিনি খুব দ্রুতগতিতে চলেছেন, আর তার পিছনে রয়েছে একজন চীনা বালক। আমার এই পশ্চাৎধাবন লক্ষ্য ক'রে তিনি ছেলেটীকে পথের সামনে দাঁড় করিয়ে একাই চলতে সুরু কোরলেন।

আমি চাকায় একটু জোর দিয়েছি এমন সময় ছেলেটি এসে সামনে

দাঁড়িয়ে পোড়ল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে গেলাম্। দাঁড়িয়ে উঠে তাকে খুব ভৎর্সনা কোরলাম।

সাইকেলে উঠে আবার যেই চালাতে যাব এমন সময় ছেলেটী এসে বাইকের হ্যাণ্ডেল ধ'রে চীনা ইংরেজীতে বোলল, "প্রভু, দয়া ক'রে একবার গাড়ী থামান।" ইচ্ছা হোল তাকে দু' এক ঘা ঘুঁসি লাগিয়ে দিই; আবার ভাবলাম থাক। চাকরটা ভয়ে শিউরে ওঠে, কিন্তু সাইকেল থেকে হাত সরায় না।

পুনরায় চাকরটা আরম্ভ কোরল, "আপনার পায়ে পড়ি; একবার আপনি থামুন।"

আমি ভৎর্সনা ক'রে বোললাম, "পালা বলছি, না'হলে তোর মাথা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেব।" ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু নড়েনা। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে মহিলাটীকে যাতে আমি অনুসরণ না ক'রতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই সে আমার চলার পথে বাধা দিচ্ছে।

আমি আর স্থির থাকতে না পেরে এক ঘুঁষিতে তাকে ধরাশায়ী করে দিলাম। সাইকেলে উঠতে গিয়ে' দেখি সামনের চাকাটা বেঁকে গেছে। কি আর করি; শেষকালে দৌড়ানই মনস্থ কোরলাম। দেশীয় লোকেদের সামনে দিয়ে মান-সম্ভ্রম বর্জ্জন ক'রে ছুটতে আরম্ভ কোরলাম। দেশীয় লোকেরা হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়েছিল। এবারে আমি উপনিবেশের মধ্যে এসে পোড়লাম।

হাঁফাতে হাঁফাতে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম, "গাড়ীটা কোথায় গেল?"

দেশীয় লোকেরা উত্তর কোরল, "এই মাত্র চলে গেল, সাহেব।"

তারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যতদূর দৃষ্টি যায়

তাকিয়ে দেখি, কিন্তু মোটারেয় চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না। বুঝলাম, ছেলেটীকে দিয়ে আমার অনুসরণের পথে বাধার সৃষ্টি ক'রে তিনি পালিয়ে গেছেন। এরকমভাবে পালিযে যাওয়ার কোন অর্থই হয়না, কারণ এদেশে শাসনকারী মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়দের কার্য্যকলাপ সকলে জানতে পারে।

যাভার মত ছোট জায়গায় এই সব ঘটনা নিয়ে আলাপ আলোচনা প্রায়ই হয়ে থাকে। মহিলাটী আমার বাড়ীতে আসার সময়ই তাঁর সোফারের কাছ থেকে নাম, ধাম সবই জেনে নিয়েছিলাম। তিনি প্রদেশীয় রাজধানী থেকে একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে বাস কোরতেন। একজন প্রসিদ্ধ ডাচ্ দেশীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ভদ্রলোকটী ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পাঁচ মাসের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু স্পষ্ট কোরেই বোলতে পারি মহিলাটী ঠিক তিন মাস পূর্ব্বেই গর্ভবতী হন।

এখন আমি আপনাদের সমস্ত বিষয়টা খুলে পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পারবো। নিজের কোন ব্যাধি হলে সহজেই তা নির্ণয় করতে পারতাম। তখন থেকে আমার অবস্থা হয়েছিল জ্বরের ঘোরে ভুল-বকা রোগীর মতো। আমি আর যেন নিজেকে সংযত করে রাখতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম, আমার আচরণ অসঙ্গত হচ্ছে, তবুও আমি বারে বারে সেই ভুলই করে যাচ্ছিলাম।

আপনি হয়তো জানেন না যে মালয়ার লোকেরা এক ধরণের মানসিক ব্যাধিতে ভোগে; আমার ব্যধিও হয়েছিল সেই ধরণের। এই রোগের লক্ষণটা এই রকম,—রোগী চুপচাপ নির্ব্বিকারের মতো বসে থাকে, বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, কোন কিছুই হয়নি। আমার ঘরে মহিলাটী আসবার আগেই আমি ঠিক ঐ রকমভাবে বসে ছিলাম। এই রোগে আক্রান্ত মালয়ার লোকেদের সেই সময়ের মনের অবস্থা এমন হয় যে তারা

যাকে তাকে ছোরা দিয়ে খুন পর্য্যন্ত করে ফেলতে পারে; একটা লোককে খুন করে সে থামে না, খুনের নেশা তার মাথায় এমনই চেপে ধরে যে পর পর সে খুনই করে চলে; শেষকালে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না।

আমিও ঠিক এই রকম ব্যাধিগ্রস্ত লোকের মত মহিলাটীকে আর একবার দেখবার জন্য উন্মাদের মত তাঁর পেছনে পেছনে ছুটেছিলাম; আমার ঘাড়ে তিনি যেন ভূতের মতোই চেপেছিলেন। আমি আর বিলম্ব না করে সুটকেশের মধ্যে কিছু টাকা ও পোষাক-পরিচ্ছদ ভরে নিয়ে সাইকেলে করে নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনের দিকে ছুটলাম। এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আমার কোন লাভই গেল না। যতদূর মনে পড়ে ষ্টেশনে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ওই পার্ব্বত্য প্রদেশে রাত্রে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ট্রেণ চলাচল বন্ধ থাকে, কাজেই আমায় রাত্রিটা ডাক বাংলোয় শুয়ে কাটিয়ে দিতে হোল। পরের দিন সন্ধ্যায় মহিলাটীর দেশে গিয়ে পৌছলাম। ষ্টেশন থেকে তাঁর বাড়ী পৌছতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগলো। আপনি হয়তো ভাববেন, এ লোকটা পাগল নাকি? সত্যি বলতে কি, আমি কোথায় যাচ্ছি আর কেন যে যাচ্ছি কিছুই ঠিক কোরতে পারছিলাম না। কার্ড বার করে চাকরটার হাতে দিলাম, কিন্তু সে ফিরে এসে জবাব দিল যে মহিলাটীর শরীর তেমন ভাল নেই, আর এ অবস্থায় কারুর সঙ্গে দেখা কোরতে তিনি প্রস্তুত নন।

রাস্তায় নেমে পড়ে অনেকক্ষণ তাঁর বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে ঘুরে ভাবতে লাগলাম, যদি তাঁর দেখা মেলে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সামনেই একটা হোটেলে ঘর ভাড়া নিলাম। কিছু বেশী মাত্রায় হুইস্কি চাপিয়ে ও তার সঙ্গে একটা ভেরান ল্ ট্যাবলেট খেয়ে অজগরের মত গভীর নিদ্রায় মগ্ন হোলাম।

জাহাজে আটবার ঘণ্টা বেজে ওঠে। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। বক্তার ঘুম ভেঙ্গে যেতে আবার গত রাত্রের কাহিনীর যোগসূত্রটা ধরে আরম্ভ কোরলেন :—

ঘুম ভাঙ্গতেই মনে হোল, যেন জ্বর হয়েছে আর একটা উন্মাদনার ভাবেও যেন মাথা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার বিকেলে বন্দরস্থিত সহরে গিয়ে জানলাম যে শনিবার দিনই তাঁর স্বামীর আসার কথা। ভাবলাম এখনও তিনদিন সময় হাতে রয়েছে, এর মধ্যেই মহিলাটিকে বিপদের হাত থেকে বাচিয়ে ফেলতে পারি। আর এক মূহুর্ত্তও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। প্রতি মূহুর্ত্তই মূল্যবান বলে মনে হোতে লাগলো। আমি মহিলাটীর সঙ্গে এমনই অসম্মানজনক আচরণ করেছিলাম যে তাঁর কাছে আর দ্বিতীয়বার অগ্রসর হোতে সাহস হচ্ছিল না। কল্পনা করুন, আপনি একজনকে গুপ্তঘাতকের হাত থেকে বাচাবার জন্য সতর্ক কোরতে প্রস্তুত, কিন্তু সে ভুল ক'রে আপনাকেই ভাবী হত্যাকারী মনে ক'রে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। মহিলাটী আমার মধ্যে দেখতে পেতেন শুধু উন্মত্ত অনুসন্ধানকারীকে, যে কুপ্রস্তাবে তার সম্ভ্রমে আঘাত দিয়েছে। সত্যি বোলতে কি, তাঁকে বিপদ থেকে বাঁচানই ছিল আমার একান্ত কামনা।

পরের দিন সকালে চীনা বালকটীকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি সত্যিই মহিলাটীকে সাহায্য কোরতে প্রস্তুত হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তিনি আমার সাহায্যে সম্ভবতঃ গ্রহণ কোরবেন। চাকরটীকে দেখে আবার পুরোণো কথা মনে হোল, দেখা কোরতে আর সাহস হোলনা। দুঃখিত মনে ফিরে গিয়ে ভাবলাম, তিনিও বেদনাযুক্ত মনে আমার সাহায্যের আশাই যেন প্রতীক্ষা করছেন।

এই অপরিচিত সহরে কি ভাবে সময় কাটাবো কিছুই ভেবে ঠিক

কোরতে পারছিলাম না। তারপর ডাচ্ রাজপ্রতিনিধির কথা মনে পড়ে গেল, মোটার দুর্ঘটনায় তার একটা পা জখম হয়ে গিয়েছিল; আমার চিকিৎসায় তিনি সেরে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে দেখা কোরতে গিয়ে আমায় সেই স্থান থেকে বদলি করবার জন্য অনুরোধ কোরলাম। আরও জানালাম, এই বন্যস্থানে বাস করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ডাক্তার যেমন রোগীর প্রতি তাকায় তিনি সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বোললেন, "আপনি স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ভুগছেন, না?" তিনি আরও জানালেন যে আমার পরিবর্ত্তে আরেকজন ডাক্তার এসে পৌছলেই ছুটী পাওয়া যাবে। ভাবলাম, দাসত্ব ক'রে নিজেকে একেবারে বিক্রি ক'রে ফেলেছি; তাঁর আদেশ অমান্য করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

আমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে বুদ্ধিমানের মতোই আমাকে না চটিয়ে তিনি বোললেন, "আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি সাধুর মতোই জীবন যাপন করছেন; আমরা আশ্চর্য্য বোধ কোরছি, আপনি এত দিনের মধ্যে একেবারেই ছুটী নেন নি। সেরকম আমুদে লোকের সঙ্গলাভ কোরলে হয়তো আপনার এ অবস্থা হোত না। আজ সন্ধ্যায় সরকারের কুঠীতে আমোদ প্রমোদের একটা বন্দোবস্ত রয়েছে; উপনিবেশের সব লোকই সেখানে যাবে; আপনার পরিচিত অনেককেই সেখানে দেখতে পাবেন।" ভাবলাম, তা'হলে কি এই পরিচিতদের মধ্যে সেই মহিলাও থাকবেন নাকি? এই নিমন্ত্রনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

সবার আগেই রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হোলাম। কুড়ি মিনিট ধরে একাই ঘরের মধ্যে বসেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে অন্য অতিথিরাও আসতে আরম্ভ করলেন; তাঁদের মধ্যে কোন কোন রাজ-

কর্ম্মচারী সস্ত্রীক এসেছিলেন। রাজপ্রতিনিধি সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা কোরলেন। এর একটু পরেই একটা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অনুভব কোরলাম।

আমাকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে হঠাৎ সেই মহিলাটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরলেন। হলদে রঙের পোষাকে তাঁকে বেশ মানিয়েছিল। তাঁর কাঁধ দুটী ঠিক আইভরির মতোই শাদা দেখাচ্ছিল। সকলের সঙ্গে তিনি বেশ মধুরভাবে বাক্যালাপ কোরছিলেন। তিনি যে অন্তরে একটা যাতনা বোধ কোরছিলেন, তাঁর মুখ থেকে শুধু আমিই সেটা বেশ অনুভব কোরছিলাম।

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু তিনি আমায় দেখেও যেন দেখতে পেলেন না। তাঁর মুখ থেকে একটা হাসির ভাব ফুটে বেরুলো। ভাবলাম, দু'একদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী এসে হাজির হবেন, আর তিনি নিশ্চিন্ত মনে হাসচেন; আর আমি আগন্তুক হযেও তাঁর ভবিষ্যৎ বিপদের কথা স্মরণ করে বিচলিত হ'য়ে উঠেছি। বুঝতে পারলাম অন্তরের বেদনাকে তিনি হাসিমুখে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা কোরছেন।

পাশের ঘর থেকে সঙ্গীতের রেশ ভেসে আসছিল; এবারে নাচ সুরু হবে। একজন মধ্য-বয়স্ক ভদ্রলোক মহিলাটীকে নাচের সঙ্গিনী হোতে অনুরোধ কোরলেন। অন্য লোকদের কাছে বিদায় নিয়ে ভদ্রলোকের হাত ধরে তিনি নাচ ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন। সামনে আমায় দেখে পরিচিতার মত তিনি বোললেন, "নমস্কার ডাক্তার।" শুধু এই কথাটী ব'লে তিনি চলে গেলেন।

তাঁর এই দৃষ্টির মধ্যে কি ভাব যে গোপন ছিল, কেউই তা' বুঝতে পারেনি। তাঁর এই অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মত আচরণে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, আমাদের পুরোনো ঝগড়াটা কি

তিনি মিটিয়ে ফেলতে চান ? তাঁর মনের প্রকৃত কি ইচ্ছা তা আমি অনুমান কোরতে পারলাম না। বেশ একটু বিচলিত হয়ে পোড়লাম। নাচবার সময় তাঁর মুখ থেকে একটা হাসির আভাস ফুটে বেরুচ্ছিল। মনে হোল, নাচের সঙ্গে এ হাসির কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয়ই আমাদের সেই পুরোনো আলাপ আলোচনার কথা স্মৃতির পটে এসে তাঁকে বেশ বিচলিত করে তুলেছে।

কথাটা স্মরণ ক'রে আমি বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পোড়লাম। আমি শুধু তাঁরই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম, এ চাহনি খুব সম্ভব তাঁর কাছে ভাল লাগছিল না। নৃত্য-চঞ্চল দেহটাকে ঘোরাবার সময় তিনি তেজ মিশ্রিত চাহনির দ্বারা আমাকে আত্মসংযম কোরতে সাবধান করে দিলেন। মনে হোল, মানসিক ব্যাধিটা আমাকে যেন বেশ জোর করে আঁকড়ে ধরেছে। মহিলাটির ইঙ্গিতের অর্থ কি আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে নবাগত অতিথিদের ভীড় ঠেলে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। অভিনন্দন জানানো দূরের কথা, কেউই আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বোলল না। তাঁর আচরণ থেকে বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার এই অনধিকার প্রবেশকে তিনি কোনমতেই অনু-মোদন কোরতে পারেন নি। আমি কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলাম। তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হযে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বোললেন, "আমি আজ বড়ই পরিশ্রান্ত, মাপ করবেন, আর থাকতে পাচ্ছিনা চোললাম, আবার আসবো, নমস্কার।"

আমার দিকে চেয়ে একটু মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তাঁকে অনুসরণ কোরলাম। নিমন্ত্রিত সকলেই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন; আমিও লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু নিজেকে আর সামলাতে না পেরে তাঁর হাত ধরে ফেলতেই তিনি

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরলেন। একটু পরেই ক্রোধকে দমন ক'রে এক ঝলক হাসি তুলে বোললেন, "ডাক্তার, আমার ছোট ছেলের ওষুধের কথা আপনার মনে পড়ে গেছে, না? আপন ভোলা বৈজ্ঞানিক মানুষ আপনারা, আপনাদের কথাই আলাদা।" তাঁর এই উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। পকেট থেকে নোটবুক বার করে একটা মেকী প্রেসক্রিপ্‌সন্ লিখে তাঁর হাতে দিতে তিনি সেটা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পোড়লেন।

সাধারণের সন্দেহের হাত থেকে তিনি আমাকে এইভাবে বাঁচিয়ে দিলেন। আমার কিন্তু মনে হোল, তিনি আমাকে কুকুরের মতোই ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন। আমি ঘরের মধ্যে দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে কাঠের তাকের কাছে গিয়ে বোতল থেকে চার পাঁচ পেগ মদ ঢেলে খেয়ে নিলাম। এতোই দুর্ব্বল বোধ করছিলাম যে মদ না খেয়ে আমার পক্ষে এক পা'ও চলা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। পাশের দরজা দিয়ে চোরের মত চুপি চুপি বেরিয়ে গেলাম। ভাবলাম, প্রচুর মদ খেয়ে অদৃশ্য জগতের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে সব ভুলে যাবো, কিন্তু তা হোল না।

মহিলাটীর বিদ্রূপের হাসি আমার কানে এসে প্রবেশ কোরছিল। সমুদ্রের ধারে বিচরণ কোরতে কোরতে হঠাৎ মনে হোল, একটা পিস্তল সঙ্গে আনলাম না কেন; তা'হলে একটা সমস্যার সমাধান হোয়ে যেতো। ক্লান্ত হোয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম; আত্মহত্যা কোরতে যে ভয় পেয়েছিলাম, তা ভাববেন না। কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করে আমাকে আত্মহত্যা স্থগিত রাখতে হোল। ভাবলাম, আমার সাহায্যের তাঁর একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আর দু'দিন পরেই মহিলাটীর স্বামীর আসার কথা। গোপনীয় ব্যাপারটী বেরিয়ে পোড়লে মহিলাটীর যে লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যাবে।

কি ভাবে তাঁর কাছে এগিয়ে বলা যায় যে আমি তাঁকে সাহায্য কোরতেই এসেছি; এইরকম ভাবতে ভাবতে একটা চেযার টেনে বসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে একটা চিঠি লিখলাম। চিঠিতে আরও জানালাম যে আমার কাজ হযে গেলেই চিরকালের জন্য তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ কোরব। আমার লেখার ভাষা ও ভাব দেখলে লোকে হয়তো পাগলের চিঠি বলেই মনে কোরত। চিঠিখানা শেষ করে ওঠার সময় আমার মাথা যেন ঘুরতে লাগলো। এক গ্লাস জল খেযে খামের মধ্যে চিঠিটা পুরে তার পেছনে লিখে দিলাম, আপনার ক্ষমার প্রত্যাশায় এখানে রইলাম; আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি আপনার কাছ থেকে কোন জবাব না পাই, তাহোলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবেনা, জানবেন। চিঠির উত্তরের অপেক্ষায বসে রইলাম।"

এইভাবে চুপ করে বসে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম; অনুভব কোরলাম সেই পুরোনো মানসিক ব্যাধিটা আমার ওপর ভূতের মত চেপে বসেছে, এর থেকে যেন নিষ্কৃতি নেই। এইরকম ভাবছি এমন সময হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। একটী দেশী বালক এক টুকরো কাগজ এনে আমার হাতে দিল; তাতে লেখা ছিল, "ভয়ানক দেরী হযে গিয়েছে, যাহোক, আপনি এখন হোটেলে অপেক্ষা করুন, সম্ভবতঃ শেষের দিকে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।"

আমার জবাব তিনি দিয়েছেন, এই ভেবে একটু আনন্দ বোধ কোরলাম। আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে; আমার সাহায্য না হোলে যে তাঁর চলবেনা, এই রকম ভাবতে ভাবতে চিঠিটা হাতে নিয়ে তাতে চুম্বনের প্রলেপ দিলাম; ক্রমশঃ মনে হোতে লাগলো যেন জ্ঞান হারিয়ে

তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে আমার চার ঘণ্টা কেটে গেল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে

এলো। দরজায় একটা টোকা মারার আওয়াজ হোতে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে সেই চীনা বালকটী দাঁড়িয়ে আছে। সে বোলল, "আমার সঙ্গে শীঘ্র চলে আসুন, দেরী কোরবেন না।" তাকে অনুসরণ ক'রে নীচে নেমে গাড়ীতে উঠে পোড়লাম।

গাড়ী ছেড়ে দিতে তাকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "ব্যাপার কি বল তো, কি হয়েছে?" ছেলেটী উদাস দৃষ্টিতে ঠোঁট দুটী কামড়ে আমার দিকে তাকাল। বহু প্রশ্ন ক'রে তার কাছে কোন জবাব না পেয়ে রাগ হোল ভাবলাম, দু'এক ঘা বসিয়ে দিলে হয়, কিন্তু তার বিশ্বস্ততা দেখে করুণায় আমার মন আর্দ্র হোয়ে গেল; হাত আর এগুল না। কোচম্যান্ ঘোড়াগুলির ওপর সজোরে চাবুক চালাতে এত জোরে গাড়ী চলতে লাগলো যে চাপা পড়ার ভয়ে রাস্তার লোকগুলিকে ছুটে পালাতে হচ্ছিল।

আমরা আস্তে আস্তে ইউরোপীয়ানদের বসতি পেরিয়ে চীনাদের বস্তিতে এসে পোড়লাম। এখানে গাড়ীটা একটা সরু গলির সামনে এসে থামলো। বস্তির পাশে হোটেল থেকে একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছিল; কয়েকটা ঘরের মধ্যে আফিংএর আড্ডা চলেছে আবার দু'চারখানি ঘরের সামনে বেশ্যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ধরণের পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে সে আমায় একটা ঘরের সামনে এনে হাজির কোরল। দরজায় ধাক্কা দিতে একটী চীনা মহিলা চীৎকার ক'রে বেরিয়ে এলো।

আমি ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে সরু পথ ধরে আর একটি ঘরের সামনে এসে পৌছলাম। দরজাটা খুলতেই একটা গুম্‌রানো আওয়াজ এসে আমার কাণে বাজলো। অন্ধকারে কিছু ঠিক কোরতে না পেরে শব্দটাকে অনুসরণ ক'রে এগিয়ে গেলাম; ছেলেটী কথা বোলতে গিয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে আমার সেই পরিচিত মহিলাটী একটা নোংরা মাদুরের ওপর পোড়ে অসহ্য যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ কোরছেন ; অন্ধকারে তাঁর মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না ; তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বুঝলাম, খুব জ্বর হোয়েছে। তাঁর অবস্থা অনুভব ক'রে আমার গা শিউরে উঠলো। বোঝা গেল, আমার কাছে সাহায্য না পেয়ে তিনি চীনা ধাত্রীর শরণাপন্ন হন। আমার ব্যাবহার ও অন্যায় দাবীতে তিনি এতই রুষ্ট হোয়েছিলেন যে এই অশিক্ষিতা চীনা ধাত্রীর হাতে মরাও শ্রেয় জ্ঞান কোরেছিলেন।

আলোর জন্যে চীৎকার করতে নার্স একটা কেরোসিনের আলো এনে হাজির কোরল। মনে হোল, তার গলাটা টিপে ধরি আবার ভাবলাম, তা কোরেই বা কি লাভ হবে। আলোর আভায় আমি অভাগিনীর দেহটা দেখতে পেলাম। আমার মন থেকে আস্তে আস্তে ভয় চলে যাওয়াতে ভাবলাম, আমি ডাক্তার হিসেবে একজন মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা কোরতে এখানে এসেছি। মাথা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে মহিলাটীকে বাঁচাতে হবে, ঠিক কোরলাম।

যে দেহের প্রতি আমি প্রবল ভাবে আসক্ত হোয়েছিলাম, রুগ্নার সেই নগ্ন শরীরের ওপর হাত চালাবার সময় আমার মনে কোনই চাঞ্চল্য এলো না। ভাবলাম, কোন রকমে যদি মৃত্যুপথের যাত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারি। চিকিৎসার ভ্রান্তিতে তার শরীর থেকে অবিশ্রাম রক্ত ধারা ব'য়ে যাচ্ছিল। ভাবলাম, এত অপরিচ্ছন্ন নোংরা স্থানে কি ভাবে রক্তস্রাবকে বন্ধ করা যায় ; সামনে পরিষ্কার জল অথবা কাপড় কিছুই মিললো না।

মুমূর্ষু রোগীকে সম্বোধন ক'রে বোললাম, "আপনাকে এখনই হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।" তিনি একটু কেঁপে হাত পা ছুঁড়ে

ব'লে উঠলেন, "না, না, তা হোতে পারে না ; এখানে মরে যাই সেও ভাল, কেউ যে আমার কথা জানতে পারবে, তা হবে না, হবে না ; আমায় আপনি বাড়ী নিয়ে চলুন, বাড়ী নিয়ে চলুন।" বুঝতে পারলাম, জীবনের চেয়েও চরিত্রের দাম তাঁর কাছে অনেক বেশী। আমরা একটা চৌকিতে ক'রে তাঁর অর্দ্ধমৃত দেহটাকে বহন ক'রে নিয়ে এসে বাড়ীতে তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিলাম। অনুভব কোরলাম, তিনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছেন।

ভদ্রলোকটী আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে বেদনা জড়িত স্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন। তারার আলোয় আমি তাঁর ঝক্‌ঝকে দন্তপংক্তি ও চশমার কাঁচ দুটী দেখতে পেলাম।

তিনি বেশ চড়া গলায় আরম্ভ কোরলেন—আপনি তো সাধারণ একজন ভ্রমণকারী মাত্র। মৃত্যুর যে কি ভীষণ যাতনা, আপনি কি তা অনুভব কোরতে পারেন ? মৃতপ্রায় ব্যক্তি বাঁচবার জন্য যে প্রবল সংগ্রাম করে থাকে আপনি কি তা কখনো লক্ষ্য কোরেছেন ? আপনি সামান্য একজন ভূপর্য্যটক মাত্র, এ সবের সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণাই আসতে পারে না। মৃত্যু যে কী ভীষণ হোতে পারে, ডাক্তারী জীবনে আমি তা লক্ষ্য করেছি ; বহু মুমূর্ষুর পাশে ব'সে জীবনের দীপশিখা নিভে যেতে দেখেছি। কত অনুরোধ কোরলাম, কিন্তু মহিলাটী কোন মতেই হাঁসপাতালে যেতে রাজী হোলেন না। নিরুপায়ের মত তাঁর পাশে ব'সে মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে হোল।

আমি বুঝতে পারি না, তাঁর সঙ্গে শুশ্রূষাকারী কেন মরে গেল না ; আবার পরের দিন সকালে উঠে আমার সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করা, এসবের কি মূল্য ? তাঁকে বাঁচাবার জন্য এত চেষ্টা কি ব্যর্থ হবে ? কোন ফলই কি মিলবে না ?

চীনা বালকটী মেঝের ওপর নতজানু হ'য়ে ব'সে ঈশ্বরের কাছে তাঁর জীবন ভিক্ষা কোরছিল ; মাঝে মাঝে ব্যাকুল নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, কোন রকমে আমি যদি তাঁকে বাঁচাতে পারি। চীনা বালকটী রক্তদান ক'রে তাঁকে বাঁচাতে প্রস্তুত ছিল ; আমিও তা কোরতে পারতাম। আবার মনে হোল, রক্ত সঞ্চারণ ক'রে লাভই বা কি হবে, তাঁর কষ্ট বাড়ানো ছাড়া আর তো কিছুই হবে না। আমি ও চীনা বালকটী তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলাম। ভাবুন, তাঁর কি ক্ষমতাই না ছিল!

প্রত্যূষে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। তাঁর সেই সময়কার চাহনির মধ্যে একটুও গর্ব্বের চিহ্ন ছিল না ; আমার দিকে হতভম্ব হয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে মনে হোল, আমাদের গত ঝগড়ার কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে ; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই যেন তিনি শান্তি পান। শান্ত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি বসবার চেষ্টা ক'রে কথা বোলতে উদ্যত হোলেন। আমি তাঁকে শুয়ে থাকতে অনুরোধ কোরলাম। তাঁর কথা জড়িয়ে আসছিল। অস্পষ্ট গলায় চুপি চুপি তিনি বলে উঠলেন, "কেউ যেন আমার কথা না জানতে পারে।"

প্রতিশ্রুতি দিলাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে আপনার কথা পৃথিবীতে আর কেউই জানতে পারবে না।" লক্ষ্য কোরলাম, তাঁর চোখ থেকে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে বেরুচ্ছে। অতি কষ্টে শুধু তিনি এই কথাটী উচ্চারণ কোরলেন, "আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করুন যে একথা কেউ জানতে পারবে না ; প্রতিজ্ঞা করুন।" আমি হাত তুলে শপথ জানালাম। এবারে তিনি আমার দিকে কৃতজ্ঞতাসূচক নেত্রে চাইলেন। এত অন্যায় করা সত্ত্বেও তিনি আমায় ক্ষমা কোরলেন। আরেকবার কথা বোলতে চেষ্টা কোরলেন ; কিন্তু হায়, সব চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হোল ; শান্তিতে

যেন গভীর নিদ্রায় তিনি অভিভূত হয়ে পোড়লেন। দিবা অবসানের আগেই সব শেষ হয়ে গেল।

চারিদিক নিঃস্তব্ধ। কথা বোলতে বোলতে অবসাদে ভদ্রলোকের মুখটা আচ্ছন্ন হোয়ে এলো, চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারাগুলি আকাশ থেকে ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে লাগলো; চারিদিক ফর্সা হয়ে এলো। আলোয় লক্ষ্য কোরলাম, তাঁর মুখখানি বিষাদে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তিনি গল্পের যোগসূত্রটা ধরে আবার আরম্ভ কোরলেন,— অবস্থাটা ভেবে দেখুন। তিনি তো গত হোলেন, কিন্তু তাঁর মৃতদেহের পাশে আমায় ব'সে থাকতে হোল। এরকম জায়গায় কতরকম মিথ্যা আজগুবি কথা নিয়ে আলোচনা হয়। আমার সেখান থেকে এক পা'ও নড়ার উপায় ছিলনা, কারণ আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে ব্যাপারটা কেউই জানতে পারবে না। চিন্তা করুন, মহিলাটী সেখানকার ভদ্র সমাজে মেলামেশা কোরতেন, আগের দিন সন্ধ্যায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে নেচে পর্য্যন্ত এসেছেন। এখন ঘটনাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পোড়বে, আর আমাকে এই মৃত্যুর সঠিক কারণ সকলের কাছে ব্যক্ত কোরতে হবে। ভাবলাম, সহকারী ডাক্তারের কাছে এ দায়িত্ব দিয়ে স'রে পড়লেই তো পারি। কি মুস্কিলেই যে পোড়েছিলাম, কি বোলব। চীনা বালকটাকে বোললাম, "তোর প্রভুর শেষ ইচ্ছা ছিল, ঘটনাটা যেন কেউই না জানতে পারে; তা কি তুই জানিস?" সে সরলভাবে উত্তর দিল, "হ্যা, আমি জানি।"

মেঝের রক্ত ও ময়লা ধুয়ে মুছে ঘরটাকে সে এমনভাবে পরিষ্কার ক'রে সাজিয়ে ফেললো যে কারুর মনে একটুও সন্দেহের উদ্রেক না হোতে পারে।

অনুভব কোরলাম, আমার কর্ম্মক্ষমতা যেন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে।

যখন একজন সব হারাতে বসে তখন একটা সামান্য বস্তুকেও কেন্দ্র ক'রে সে বেঁচে থাকতে চায়। আমার অবস্থাও হয়েছিল ঠিক সেই রকম। তাঁর সেই অনুরোধটুকুই ছিল আমার শেষ সম্বল; সেইটেকে বজায় রাখাই হোল আমার শেষ কর্ত্তব্য। মনকে সংযত করেছিলাম; ভাবলাম, যদি কেউ তাঁর মৃত্যুর অনুসন্ধান করে, তা'হলে একটা ব্যাধির নাম ক'রে দেওয়া যাবে যেটা সচরাচর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হয়ে থাকে। আমি তো ডাক্তার; আমার কথায় কেউই অবিশ্বাস কোরতে পারেনা। সাধারণ লোকে অনুসন্ধান কোরতে, আমি বোললাম যে মহিলাটী পীড়িত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনা চাকরটীকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠান।

আমি প্রধান চিকিৎসকের জন্যে অপেক্ষা কোরছিলাম, তাঁরই মৃতদেহ পরীক্ষা করার কথা। ন'টার সময় তিনি উপস্থিত হোলেন। আমাকে বদলী করার ক্ষমতা তাঁর হাতের মধ্যেই ছিল।

ভদ্রলোক আমার হাত যশের জন্য ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাঁর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরতে, তিনি আমায় প্রশ্ন কোরলেন, "ম্যাডাম ব্লাঙ্ক্ কি মারা গেছেন?"

আমি উত্তর দিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকাল ছ'টায়।

তিনি আবার প্রশ্ন কোরলেন,—আপনাকে তিনি কোন সময় ডেকে পাঠান?

আমি বোললাম,—গতকাল সন্ধ্যায়।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন,—জানেন, আমিই তাঁর বাড়ীর ডাক্তার; একথা জেনেও আপনি আমায় ডাকলেন না কেন?

আমি বোললাম,—ডাকবার আর সময় ছিলনা, আমার ওপর তিনি নির্ভরশীল হয়ে বলেছিলেন, আমি যেন আর অন্য কোন ডাক্তারকে না ডাকি।

তিমি রাগান্বিত স্বরে উত্তর দিলেন,—আপনি আপনার কর্ত্তব্য কোরেছেন বটে, কিন্তু আমায় পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে, এই অকস্মাৎ মৃত্যুর প্রকৃত কারণটা কি।

কোন উত্তরই আমার মুখে এলো না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তিনি সেই মৃতার দেহ পরীক্ষা কোরতে উদ্যত হয়েছেন এমন সময আমি বলে উঠলাম, "মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করে কি হবে, আমি আপনাকে সব খুলে বলে যাচ্ছি, শুনুন। ম্যাডাম ব্লাঙ্ক্ একজন দেশী চীনা নার্সকে দিয়ে গর্ভপাতের চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হ'যে আমায ডেকে পাঠান। যখন পৌছলাম, রোগীর অবস্থা তখন খুবই খারাপ। তাঁকে কোনমতেই বাঁচান গেলনা।

মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে তিনি মিনতি ক'রে বলেছিলেন, তাঁর কলঙ্ক যেন কেউ না জানতে পারে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তাঁর এ অনুরোধ আমি রক্ষা কোরব।

ভদ্রলোক একটু বিদ্রূপের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আপনি কি চান, আপনার কলঙ্ককে আমি চেপে যাব ?"

আমি উত্তর দিলাম,—আপনি ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝে দেখুন। তাঁর এই কলঙ্কে অন্য লোক লিপ্ত ছিল। আপনি ভুল বুঝবেন না, আমি এর মধ্যে নেই। আমি এপাপে লিপ্ত হলে, নিশ্চয় আমায় জীবিত অবস্থায় দেখতে পেতেন না। মহিলাটীর চরিত্র মসীলিপ্ত না ক'রে আপনি অপরাধীকে অভিযুক্ত কোরতে পারেন না ; এতে আমারও প্রাণে বড় ব্যথা লাগবে, জানবেন।

ডাক্তার জবাব দিলেন,—এতে আপনার ব্যথিত হবার কি আছে ? আপনি যে প্রভুর মত ভৃত্যকে আজ্ঞা কোরছেন, দেখতে পাচ্ছি। পরীক্ষা

ক'রে মৃত্যুর সঠিক কারণ লিখে যাব। মেকী সার্টিফিকেট্ কোন মতেই দিতে পারবনা।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম,—আপনাকে দিতেই হবে, তা না হোলে জীবিত অবস্থায় এ ঘর থেকে আর বেরুতে হবেনা।

আমি খালি পকেটে হাত দিয়ে একটা পিস্তল ওঠাবার ভাণ কোরতেই তিনি ভয়ে পেছিয়ে গেলেন।

আবার আরম্ভ কোরলাম,—আমার জীবনকে সামান্যই জ্ঞান ক'রে থাকি। মহিলাটীকে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি তা পালন কোরবই। শুনুন, আপনি সার্টিফিকেটে লিখে দিন, কোন এক সংক্রামক ব্যাধিতে মহিলাটী আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়; তাতেই মৃত্যু ঘটে। আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাচ্যদেশ ছেড়ে চলে যাব। এতেও যদি সন্তুষ্ট না হন আমি এমন কথাও বলছি যে মহিলাটীকে কবর দেবার পর, রিভলভারের গুলিতে আমার মাথার খুলি নিজেই উড়িয়ে দেব। এতে আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন আশা করি।

আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে তিনি বেশ ভয়ে পেয়ে গেলেন।

তিনি আবার আরম্ভ কোরলেন,—জীবনে আমি কারুকে এই ধরণের মেকী সার্টিফিকেট দিইনি! এরকম কাজ আমার কাছে অধর্ম্ম বলে মনে হয়।

আমি বোললাম,—আপনি ঠিক বলেছেন, এ ধরণের কাজ কোরতে আপনাদের আত্মসম্মানে বাধে, কিন্তু এটা একটা গুরুতর ব্যাপার। বুঝতে পারছেন, এ ক্ষেত্রে সত্য ঘটনাটা বেরিয়ে পোড়লে, জীবিত ভদ্রলোকটীকে সারা জীবন মানসিক অশান্তি নিয়ে কাটাতে হবে, আর তার সঙ্গে মৃতা

নারীর কলঙ্কও চারিদিকে ছড়িয়ে পোড়বে। আপনি কেন এত বিচলিত হচ্ছেন? মত দিয়ে ফেলুন।

ভদ্রলোক সম্মতি জানাতে আমরা দুজনে মিলে সার্টিফিকেটের খসড়া তৈরী ক'রে ফেললাম।

এরপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বোললেন,—আপনি জাহাজে ক'রে সামনের সপ্তাহে ইউরোপে রওনা হবেন।

উত্তরে আমি বোললাম, "নিশ্চয়ই, সে প্রতিশ্রুতি তো আগেই আমি দিয়েছি।"

ভদ্রলোকের আচরণে ও কথাবার্ত্তায় মনে হচ্ছিল, ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে তিনি ওস্তাদ।

মানসিক চঞ্চলতাকে চাপা দেবার জন্য তিনি আরম্ভ কোরলেন, "ভদ্রলোক সম্ভবতঃ স্ত্রীর মৃতদেহ ইংলণ্ডে নিয়ে যাবেন। বড় লোকের খেয়াল তো। আপনি ভাববেন না, আমি কফিন তৈরী করিয়ে তার মধ্যে মৃত দেহটি খুব ভাল ক'রে শীল করার ব্যবস্থা ক'রে দেব। ভদ্রলোক এলেই বুঝতে পারবেন যে এরকম গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, মৃতাকে নিয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা ক'রে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ভদ্রলোকটী আমার বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলেন; অবশ্য এর প্রকৃত কারণ হোল, আমার কাছ থেকে চিরকালের মত নিষ্কৃতি লাভ ক'রে তিনি পুরোদস্তুর লাভবানই হবেন।

এর একটু পরেই আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে তিনি ব'লে উঠলেন, "আশা করি আপনি শীঘ্রই সেরে উঠবেন।"

তাঁর কথা থেকে মনে হোল, তিনি আমায় ব্যাধিগ্রস্থ অথবা উন্মাদ ভাবলেন নাকি? তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার

শরীর অবসন্ন হয়ে এলো। মৃতার শয্যার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ এইভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম জানিনা। . .

হঠাৎ কাণের মধ্যে একটা আওয়াজ প্রবেশ কোরতে চোখ মেলে দেখলাম, চীনা বালকটা দাঁড়িয়ে আছে। সে বোলল, "কে একজন ভদ্র-লোক এসেছেন"।

আমি বোললাম,—যেই হোক, খবরদার, ভেতরে আসতে দিবি না।

ছেলেটা কথা বোলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছিল, আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম, "কে সে লোকটা?"

সে শুধু বোলল, "সেই লোকটা"। মনে হোল, লজ্জায় সে কোন নামই বোলতে পারছিল না। আমি তার কথার ভাবেই বুঝে নিলাম লোকটা কে।

আপনি হয়তো শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে ভদ্রমহিলা আমার অন্যায় দাবীটা প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে গোপনীয় ব্যাপারে লিপ্ত ভদ্র-লোকটির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

লোকটাকে ভালবেসে কোন দুর্বল মুহূর্ত্তে মহিলাটী দেহ দান ক'রে ফেলেন। আমার অন্যায় দাবীকে কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান কোরেছিলেন। আগে হলে, হয়তো তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতাম, কারণ সেই ছিল তাঁর আসল প্রণয়ী।

পাশের ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখতে পেলাম একটা সুন্দর তরুণকে, বেদনায় তার মুখখানা যেন ভরে গিয়েছে; একটা তরুণসুলভ কোমলতাও তার মধ্যে দেখতে পেলাম।

নমস্কার কোরতে গিয়ে তার হাতটা কেঁপে গেল, ভাবলাম, তাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করি। প্রকৃত প্রেমিক হোতে গেলে যে ক'টি গুণের

প্রয়োজন, সব ক'টিই তার মধ্যে রয়েছে, লক্ষ্য কোরলাম। মহিলাটি যে তার প্রতি আসক্ত হবেন, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?

অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে সে শুধু একবার বোলল, "আমি ম্যাডাম ব্লাঙ্ক্‌কে মাত্র একবার দেখতে চাই।"

তরুণের কাঁধে হাত দিয়ে ঘরের দিকে নিয়ে যাবার সময়, কৃতজ্ঞতা-সূচক নেত্রে সে আমার দিকে তাকালো। মনে হোল, যেন ঠিক টানা-পোড়েনের সূতোর মত আমরা দুজনে আবদ্ধ হয়ে গেছি।

দুজনেই মৃতার শয্যাপার্শ্বে গেলাম, কাছে থাকলে যদি তার মনে সঙ্কোচ আসে, এই ভেবে আমি একটু দূরে সরে গেলাম। হঠাৎ যুবকটি অভিভূত হয়ে মাটিতে পড়ে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠল। আমি আর কি করতে পারি, এই ভেবে তাকে তুলে, সঙ্গে নিয়ে সোফায় বসে পোড়লাম। সান্ত্বনা দেবার প্রয়াসে তার কুঞ্চিত সুন্দর চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন কোরতে লাগলাম।

যুবকটি আমার হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে করুণনয়নে জিজ্ঞাসা কোরল, "ডাক্তার, আমায় বলুন, সত্যিই কি তিনি আত্মহত্যা কোরেছেন ?"

আমি বোললাম—"না"।

তরুণটি আবার জিজ্ঞাসা কোরল,—তা'হলে কি এর জন্য অন্য কেউ দায়ী ?

পুনরায় আমি বোললাম,—কেউই না, এ শুধু নিয়তিরই পরিহাস।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো,—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। গতরাত্রের ঠিক আগের রাত্রে তাঁর সঙ্গে নাচঘরে আমার দেখা হয়েছিল। এত শীঘ্র কি ক'রে তিনি মরতে পারেন ?

আমি নানারকম মিথ্যা কথা ব'লে, প্রকৃত ঘটনাটা চেপে গেলাম। পাছে মৃতার প্রেমিকের মনে কোন আঘাত লাগে, সেদিকে আমায় বেশ

লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল। তাকে আমি জানতে দিইনি যে মহিলাটি গর্ভপাতের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন, আর তাঁর সেই অনুরোধ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। তার সঙ্গে দুদিন ধরে শুধু মহিলাটিকে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

কফিন বন্ধ করবার পর মৃতার স্বামী এসে হাজির হলেন। চারদিকে নানারকম আজগুবী ধরণের খবর ছড়িয়ে পোড়ছিল। ভদ্রলোক সন্দিগ্ধচিত্তে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করার জন্য আমার খোঁজ কোরছিলেন। যে নারী তাঁর হাতে নির্যাতিত হযেছে, তাঁব সঙ্গে দেখা কোরতে আমার প্রবৃত্তি হোল না।

চারদিন ধরে নিজের ঘরের মধ্যে লুকিযে রইলাম। মৃতার প্রেমিক আমার জন্য ছদ্মনামে একটা পাসপোর্ট সংগ্রহ ক'রে দিল, সেটা নিয়ে গভীর রাত্রে আমি সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে আরোহণ কোরলাম। আমার যা কিছু ধন, দৌলত সবই পেছনে ফেলে এলাম। তাঁর জন্য আত্মসম্মানকেও জলাঞ্জলি দিয়ে এলাম। বাড়ীর ওই আবহাওয়ার মধ্যে বাস ক'রে আমার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছিল, তাই রাত্রে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছিলাম শুধু তাঁকে ভোলবার জন্য, তাঁর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য।

আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হোল। মধ্যরাত্রে আমার বন্ধুর সঙ্গে জাহাজে উঠেছি, এমন সময় লক্ষ্য পোড়ল, কপিকলে ক'রে পেতলে মোড়া একটা কফিন তোলা হচ্ছে।

মনে হোল, আমি যেমন তাঁকে পাহাড় থেকে সমুদ্রের তীর পর্যান্ত অনুসরণ করেছি, এই কফিনটাও ঠিক তেমনিভাবে আমার পেছু নিয়েছে; এ থেকে যেন নিষ্কৃতি নেই। কফিনের পাশেই মৃতার স্বামী দাঁড়িয়েছিলেন; সেদিকে চাইতে আর আমার ইচ্ছা হোল না। বুঝতে পারলাম,

ভদ্রলোক ইংলণ্ডে গিয়ে মৃতার দেহ পরীক্ষা করিয়ে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয় কোরতে চান।

ঠিক কোরলাম, যাই হোক, এই কফিনটাকে আমি শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করে যাব আর প্রাণ দিয়ে চেষ্টা কোরব, যাতে ভদ্রলোক স্ত্রীর মৃত্যুর কারণটা জানতে না পারেন।

এখন আপনি বুঝতে পারছেন, কেন আমি যাত্রীদের অনর্গল হাসি আর কলরব সহ্য কোরতে পারিনা। তাঁর মৃতদেহ এই জাহাজের নীচের তলায় রয়েছে। দিবারাত্র শুধু সেই কফিনের কথাই আমার মনে হচ্ছে; মৃতার সেই অন্তিম অনুরোধের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। যেরকম কোরেই হোক, আমার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরতে হবে। এখনও ভয় হচ্ছে, বুঝিবা গোপন কথাটা বেরিয়ে পড়ে; যেমন ভাবেই হোক, তাঁর সুনাম রক্ষা আমি কোরব।

জাহাজের মাঝখান থেকে হঠাৎ কিসের একটা আওয়াজ হোতে ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে বোললেন, "এখানে আর আমি বোসব না।" নেশার ঘোরে ভদ্রলোকের চোখ দুটি রক্তবর্ণ হোয়ে উঠেছিল। তাঁর এই আকস্মিক আচরণে আমি একটু অবাক হোয়ে গেলাম। আমার কাছে এইভাবে তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য তিনি বেশ একটু লজ্জা বোধ কোরলেন।

বন্ধুত্বসূচক স্বরে আমি বোললাম, "আজ সন্ধ্যায় আমার কামরায় দয়া ক'রে কি পায়ের ধূলো দেবেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বিদ্রূপের সঙ্গে

একটু হেসে ঠোঁট দুটি কামড়ে বোললেন, "ধন্যবাদ, আমার একা থাকাই ভাল। আরেকটা কথা শুনবেন?"

আমি বোললাম—বলে যান।

ভদ্রলোক বোললেন,—কল্পনাও কোরবেন না যে সব কথা আপনাকে খুলে ব'লে আমি সান্ত্বনা লাভ করেছি। জানেন, আমার জীবনটা ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। এ'কে জোড়া লাগাবার কোন উপায় দেখছি না। ডাচ্‌ উপনিবেশে চাকরী ক'রে আমার কোন লাভই হোল না। পেন্সন বন্ধ হয়ে গেল। এখন আমায় জার্ম্মানীতে ভিখারীর মত কপর্দ্দক-হীন হ'য়ে ফিরতে হবে। বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন ঘনিয়ে আসছে। আপনার সঙ্গ লাভ কোরে নিজেকে ধন্য মনে কোরছি।

নির্জ্জন কামরার মধ্যে আমার সময় কাটাবার একমাত্র সাথী হোল, সুরা; শুধু এই জিনিষটা আমার প্রাণে এনে দিতে পারে নিবিড় শান্তি। আর এক দোসরের কথা আপনাকে বোলতে ভুলে গেলাম, সেটা হচ্ছে পিস্তল। স্বীকারোক্তিতে যে আনন্দ আমি লাভ কোরলাম, তার থেকে আমার আত্মার মধ্যে অনেক বেশী শান্তি আনয়ন কোরবে এই পিস্তল।

তিনি একটু থেমে আবার আরম্ভ কোরলেন, "আপনাকে আটকে রেখে আর আমি কষ্ট দিতে চাই না"।

তাঁর চাহনি থেকে বেশ বুঝতে পারলাম, তাঁর অন্তরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রকমের লজ্জা আশ্রয় ক'রে রয়েছে। আমাকে আর একটিও কথা না ব'লে তিনি কামরার দিকে চলে গেলেন।

গভীর রাত্রে ডেকের ওপর কয়েকবার অন্বেষণ কোরেও তার দেখা পেলাম না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই শোকার্ত্ত ডাচ্‌ ভদ্রলোকটীকে আবিষ্কার

ক'রে ফেললাম। তিনি নীরবে আপনার মনে ডেকের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

নেপল্স্ বন্দরে জাহাজ এসে পৌছাবার পর অধিকাংশ যাত্রীরাই সেখানে নেমে গেল। তাদের সঙ্গে আমিও নেমে অপেরায় নাচ দেখে, একটা সুন্দর কাফেতে রাত্রির আহার শেষ কোরলাম।

জাহাজে ফিরে আসার সময় একটা গোলমালের শব্দ আমার কাণে এসে পৌছল। দেখলাম, সামনেই নৌকোগুলি থেকে মাঝিরা টর্চ্চ ফেলে কি যেন অন্বেষণ কোরছে। ব্যাপারটা কি, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

জাহাজটা জেনোয়ায এসে পৌছাবার পর, একখানা খবরের কাগজ কিনে পোড়ছি এমন সময় একটা সংবাদের দিকে নজর পোড়তে চমকে উঠলাম। তার বিবরণটা হোল এই রকম, অন্ধকারের মধ্যে ডাচ্ বন্দর হোতে আগত একটি মহিলার শবাধার জাহাজ থেকে নৌকোয় নামান হয়, মৃতার স্বামীও সেই নৌকোর মধ্যে ছিলেন; নৌকোটা সামান্য একটু এগিয়েছে, এমন সময় একজন পাগল হঠাৎ জাহাজের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নৌকোর ওপর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ক'ফিন সমেত নৌকোটা ডুবে যায়। মৃতার স্বামী ও অন্যান্য আরোহীরা কোন রকমে বেঁচে যান। এই সংবাদের গায়েই আরেক যায়গায় লেখা রয়েছে—নেপল্স বন্দরের ধারে একজন অপরিচিত লোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে; মৃত ব্যক্তির মাথায় একটা গুলির চিহ্নও রয়েছে।

কোন লোকই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে এই ঘটনার যোগ আছে বলে মনে করে না।

এতক্ষণ যার কথা ব'লে গেলাম, কাগজটা পড়ার সময় শুধু সেই ভদ্রলোকের বিষাদপূর্ণ মুখখানিই আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো।

সরাইখানা

ডাক পিয়নকে জিজ্ঞাসা কোরলাম,—যায়গাটার কি নাম বোলতে পার ?

সে বোলল,—ক্রানসাক্।

আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম,—এখানে রাত্রে আরাম ক'রে থাকবার কোন ব্যবস্থা আছে, বোলতে পার ?

সে বোলল,—এখানে খুব ভাল একটা সরাইখানা রয়েছে ; কাছাকাছি এমন্ সুন্দর বিশ্রামের জায়গা আর কোথাও পাবেন না।

এত পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম যে আশ্রয়ের কথা কর্ণে প্রবেশ করাতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। অসুখ থেকে সবেমাত্র সেরে উঠেছি, তার ওপর আবার কয়েকশ' মাইল পথ এখনও পর্য্যন্ত যেতে বাকি রয়েছে। আমার সৈন্যদল পার্পিগ্নাতে বর্ত্তমানে ঘাঁটী গেড়ে রয়েছে। স্থানটির দূরত্ব এখান থেকে বড় কম হবেনা। অরণ্যপরিবৃত পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত, সুন্দর সরাইখানার সামনে এসে পৌছলাম। পিয়ন টমাস্ গাড়ী থেকে মালপত্র নামিয়ে নিল।

গৃহস্বামী আমাকে অভ্যর্থনা করে, ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে লোকজনদের মালগুলি তুলে আনতে হুকুম কোরলেন। ঘরখানি প্রশস্ত ও সুসজ্জিত। ছোট ছোট মেয়েদের মেলা বসেছে সেখানে। কেউ টেবিলের ওপর

বসেছে, কেউ বা নীচে বসে আছে, দু'এক জন জানলার ধারেও গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন সুন্দরী ষোড়শীও এক বছরের একটি শিশুকে কোলে নিয়ে অন্যজনদের সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ঘরের কোণে একজন যুবক মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ; শিশুদের কলরব ও নাচের শব্দে সে একটু যেন অস্বস্তি বোধ কোরছিল।

গৃহস্বামী ঘরের মধ্যে ঢুকে বোললেন,—অ্যানেট্, তুমি তোমার দলবল নিয়ে বাইরে যাও ; আর ফ্যানী, তুমি আট নম্বর ঘরে এই ভদ্রলোকের থাকার ব্যবস্থা করে দাও। শুধু আজকের রাত্রের মত ইনি এখানে থাকবেন।

কিশোরী অ্যানেট্ ছোটদের দলবল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পোড়ল।

সুন্দরী ফ্যানী নৃত্যচপল ভঙ্গিমায় যুবকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বোলল, "দার্শনিক, আমার ছোট বোনটিকে একটু আগলাতে হবে"। এই ব'লে শিশুটিকে তার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে কাজ কোরতে চলে গেল।

গৃহস্বামীকে সম্বোধন ক'রে আমি বোললাম, "আপনি খুবই ভাগ্যবান ; এ শিশু সন্তান আপনার, না ?"

মিঃ আলব্রেট্—অর্দ্ধেকগুলি আমার বটে, আর অন্য যে সব শিশু দেখছেন তারা আমার তৃতীয় মেয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে এসেছে।

আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম, "আপনার ক'টি ছেলে মেয়ে, মিঃ আলব্রেট্ ?

মিঃ আলব্রেট্—বেশী নয়, মাত্র ছ'টি মেয়ে।

আমি বোলে উঠলাম, "হায় ভগবান, সবই মেয়ে ! ছ'টিই মেয়ে।"

মিঃ আলব্রেট্—ক্যাপ্টেন্, জানেন, মেয়েরা যদি সুন্দরী হয়, তা'হলে বাপের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। মেয়েদের জন্য বাপকে সকলেই তোষামোদ ক'রে থাকে। ফ্যানীর অবস্থা দেখে আমার ওই কথাই মনে

হয়। ফ্যানী চলে গেলে অ্যানেট্ তার পদাঙ্ক অনুসরণ কোরবে। অ্যানেট্ বিদায় নিলে, জুলিয়েট তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে; সে চলে গেলে, কেট্ তার স্থান দখল কোরবে। কেটের পরে আসবে সিলেস্টাইনের পালা আবার পঞ্চম মেয়েটি বিদায় নিলে, ষষ্ঠ মেয়ে সিসেট্ এসে অভিনয়টা বজায় রাখবে।

আমি বোললাম,—সব ক'টি মেয়ে এই ভাবে স্বামী জুটিয়ে সরে পড়বে, এ'তো ভাল নয়; সব মেয়ে চলে গেলে আপনার অবস্থা কি হবে?

মিঃ আলব্রেট্—আমি একেবারে অন্য ধরণে জিনিসটা ভেবে থাকি। এটা বুঝতে পারছেন না যে মেয়েদের বিয়ে দেবার পর, আমি কতটা লাভবান হবো? চারদিক থেকে দাদু ব'লে ডাকতে থাকবে, সে আনন্দের অনুভূতিটা কি রকম হবে ভেবে দেখুন তো একবার?

বোললাম,—মিঃ আলব্রেট্, আপনি মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কোরছেন। ভেবে দেখুন তো, ছ'টি মেয়ের বদলে যদি ছ'টি ছেলে এসে ঘর আলো কোরত, আপনার বুকটা কি আরো বেশী আনন্দে ফুলে উঠতো না?

মিঃ আলব্রেট্—বাপ্ রে, অশান্ত ছেলেগুলোর ভাবনায় এতদিনে চুলগুলো সব পেকে যেত। সর্ব্বক্ষণ তাদের চিন্তায় মনটা ভরে থাকতো। বেঁচে থাক আমার মেয়েরা, এরাইতো আমার মনকে এখনও পর্যান্ত সবুজ করে রেখে দিয়েছে। ছেলেরা বড় হ'লে তাদের মধ্যে কেউ হয়তো ব্যবসাদার হয়ে সর্ব্বক্ষণ হিসেব নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, দ্বিতীয় জন দেশ রক্ষা করতে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে অকর্ম্মন্য হ'য়ে পোড়ত; তৃতীয় জন যুদ্ধে প্রাণ হারাতো; চতুর্থজন জলে স্থলে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতো; পঞ্চমটি টাকা পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো, আর ষষ্ঠ বুদ্ধির দিক দিয়ে বাপকে ছাপিয়ে যেত।

ফ্যানী নৃত্যভঙ্গিমায় মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন জানিয়ে আমাকে বোলল, "থাকবার সবকিছু বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি, দয়া ক'রে এখন ঘরের মধ্যে এলেই হয়।"

আমি টুপিটা খুলে ঘরের মধ্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হোলাম।

ফ্যানী আবার সুরু কোরল, "আদেশ কোরলে আমি নিজেই আপনাকে ঘরটি দেখিয়ে দিতে পারি।"

এর ঠিক পরেই দার্শনিকের কাছে এগিয়ে সে বোলল, "দার্শনিক মশাই, আপনি ছোট মহিলাটির সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করছেন না ; ওর দিকে চেয়ে দেখুন, কেমন আপনার দিকে চেয়ে হাসছে। হাতে একটা চুমা দিয়ে বলুন, আমায় মাপ করো।"

কথা বোলতে বোলতে ফ্যানী শিশুটির কচি হাত নিয়ে ভদ্রলোকের ঠোঁটে ছুঁইয়ে দিল। দার্শনিক একটা দুঃখপূর্ণ হাসির সঙ্গে চোখটা একবার ঘুরিয়ে নিলেন।

ফ্যানী নাচতে নাচতে আমার কাছে এগিয়ে এসে বোলল, আজ্ঞা হোক; কি কোরতে হবে।

এই ব'লে সে আমার সামনে দিয়ে ওপরে উঠে গেল। সে সুন্দর ঘরখানির দরজা খুলে আমার জন্য অপেক্ষা কোরতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে ওপরের ঘরের কাছে এসে বোললাম, "দেরীর জন্য আমায় মাপ কর, ভাই। জান তো, এই সবে মাত্র আমি অসুখ থেকে উঠেছি।"

ফ্যানী—আপনি মোটেই ভাববেন না এখানকার ঝরণার এমন আশ্চর্য্য গুণ যে তাতে স্নান কোরলে আপনি একেবারে সেরে যাবেন।

আমি—ফ্যানী সুন্দরী, এ খবরতো আমি মোটেই জানতাম না। এখানকার ঝরণার জল বুঝি ওষুধের মত কাজ করে ?

ফ্যানী—সারা পৃথিবীতে এর নাম ডাক আছে, জানেন ? টাউল্যাউস্' এমন কি মণ্ট্পেলিয়ার থেকে লোকেরা এখানে এসে থাকে। রোগীরা এখান থেকে একেবারে সেরে গিয়ে হাসিমুখ নিয়ে বাড়ী ফেরে, জানেন ?

আমি—ফ্যানী সুন্দরী, তোমায় ছেড়ে গিয়ে মনে সত্যিকারের আনন্দ আসতে পারে কি ?

ফ্যানী—ওসব কথা এখন রাখুন। জানেন তো, লোকেদের এমনই বিরক্ত করি যে না পালিয়ে আর তাদের উপায় থাকে না।

আমি—তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, আমার পেছনে ওরকম একটু লাগোনা।

ফ্যানী—আচ্ছা, এখনকার মত নীচের তলায় গিয়ে দার্শনিকের কাছ থেকে বোনটিকে নিয়ে আসি তো, তার পর দেখা যাবে।

আমি—আচ্ছা, তোমরা যাকে দার্শনিক বল, তিনি কে, জিজ্ঞাসা কোরতে পারি ?

ফ্যানি—যুবকটি হোলেন খুব ভদ্র, অমায়িক, চতুর, কিন্তু তাঁর একটা শুধু দোষ, তিনি মোটে হাসতেই পারেন না। কথা বলেন খুব অল্পই, আর মনে হয় কিছুতেই যেন শান্তি পান না। ভদ্রলোকের নাম হোল—ওরনি। মাঝে মাঝে তিনি স্নান কোরতে এখানে আসেন।

কথা বোলতে বোলতে মাথা নীচু ক'রে নমস্কার জানিয়ে ফ্যানি চলে যায়। আমার মনে হোল, সত্যিই মেয়েটি যে কোনও লোককে ব্যতিব্যস্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট সুন্দরীই, বটে। না, স্নানের নাম করে আরেক দিন এখানে থেকেই যাই। এরকম অনাবিল আনন্দ আর কোথায় পাব ? মনের আনন্দ একটু চাই বৈকী ! এ না হোলে, বাঁচব কেমন ক'রে ? ঘরে একা একা বসে ক্লান্তি আসে, ভাল লাগেনা, এবার বেরিয়ে পড়া যাক ; কৈ পাখীটা কোথায় গেল ; ফ্যানি পাখী আমার, কোথায় আপনার

'মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে! আমার সাথী হিসেবে এখানে তো একমাত্র দার্শনিককে দেখতে পাচ্ছি।

মাঝে মাঝে দার্শনিক ভদ্রলোকটি জানালার কাঁচে সামরিক কায়দায় টোকা মেরে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "এখানকার ঝরণার জল কেমন, বোলতে পারেন?"

দার্শনিক---বিশ্রী জল, পচা ডিমের মত গন্ধ।

আমি—অবশ্য আমি যে ঠিক স্নানের জন্য এসেছি তা নয়, মনে হোল, যায়গাটার আশপাশ দেখতে বেশ সুন্দর. এই ভেবেই এখানে এলাম. আর কি!

দার্শনিক—জায়গাটা অবশ্য ভাল. তা' হলে হবে কি, আমি কিন্তু এখানকার লোকগুলোকে একেবারে বরদাস্ত করতে পারি না।

আমি--তা'হলেও ফ্যানীর উৎপীড়ন নিশ্চয় সহ্য করা যায়।

দার্শনিক মৌমাছির মত গুন্ গুনানি আমার ভাল লাগেনা।

আমি তার দিক থেকে চোখ ফেরাতেই হঠাৎ ভদ্রলোকের এক তীব্র চীৎকার কাণে এলো; ফিরে দেখি, ফ্যানী মধুর দৃষ্টিতে একটা আক্রমণের ভাব নিয়ে দার্শনিকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম, দুষ্টু ফ্যানী দার্শনিকের পিঠে পিন্ ফুটিয়ে সেটি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, আর দুষ্টুমির হাসি হাসছে।

ফ্যানী বললে,—বুঝতে পারছেন তো মৌমাছিরা হুল ফোটাতেও জানে। শুনছেন, এটা আমার একটা ছোট ধরণের শাস্তি।

আমি বোললাম, তা বোলে তুমি ওর বুকে ওই রকম আঘাত দেবে?"

ফ্যানী—আপনি তো জানেন না, ভদ্রলোকের কি কঠিন প্রাণ, ওটুকুতে ওর কিছুই হয় না।

ফ্যানির কথায় দার্শনিক কি যেন বিড় বিড় করে বোলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম, আশ্চর্য্য, এত সুন্দর চেহারা থাকতেও ভদ্রলোক এই সুন্দরী মেয়ের রসিকতাও পর্য্যন্ত সহ্য কোরতে পারেন না।

একা থাকতে ভাল লাগে না, ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ীর চার পাশ তন্ন তন্ন করে দেখতে দেখতে সংলগ্ন বাগানের মধ্যে ঢুকে পোড়লাম। ফ্যানির ছোট বোন অ্যানেট্ গাছে জল দিচ্ছিল; তার কার্য্য কলাপ আমার বেশ ভালই লাগছিল। মনে হোল, এরকম মেয়ে যার সঙ্গিনী সে ভাগ্যবান বৈকী। ফ্যানী যৌবনের দরজায় পা দিলেও স্বর্গের পরীর মত পবিত্রতা রক্ষা করে আসছে; রং বেরং এর ফুলের মাঝখানে ঘুরে বেড়াবার সময় মনে পড়িয়ে দেয়, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা ভার্জিন মেরীর কথা।

আমার পায়ের শব্দে চমকে গিয়ে অ্যানেট্ জিজ্ঞাসা করে, "কে?"

—"চোর," আমি বলি।

হেসে জিজ্ঞাসা করে, "কি চুরি করবে সে?" আমি উত্তর দিই,—কেন, অ্যানেটের প্রিয় ফুলটি।

মেয়েটি ফুলের সাজিটি রেখে লজ্জার ভাণ করে এগিয়ে এসে বলে, "তাহলে নিজের চোখে দেখতে চাই, কেমনতর চোর।"

আধফোটা গোলাপের দিকে চেয়ে বলি, "ওটা কি তুলতে পারি?"

—চোর কি ব'লে ক'য়ে চুরি ক'রে নাকি—ব'লে অ্যানেট্ একটা ফুলকাটা কাঁচি নিয়ে এগিয়ে আসে।

—নিজের জন্য চুরি কোরবনা এটা ঠিক,—উত্তরে আমি বলি।

—কাকে ফুলটা দেওয়া হবে শুনি? —অ্যানেট্ প্রশ্ন করে।

আমি বলি—ক্রান্সাকের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দর মেয়ে, তাকেই দেব ফুল।

অ্যানেট্—সেতো ভাল কথা ; কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে এখানকার সব মেয়েকে চিনে ফেলেছেন, আশ্চর্য্য কথা !

আমি—এখানকার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে কে, আমি ভাল রকম জানি।

অ্যানেট্—আমায় দেখিয়ে দেবেন তাকে ?

আমি, "একটু দাঁড়াও", এই ব'লে যেই মেয়েটির সুন্দর অলকগুচ্ছের মাঝে ফুলটি গুঁজে দিয়েছি, অমনি হাসির ঝলক তুলে অ্যানেট্ বলে উঠলো, "আপনি ভুল করেছেন, আমার বোন ফ্যানিই কিন্তু সকলের থেকে সুন্দর।"

আমি—অ্যানেট্ সুন্দরী, তর্ক কোরলে চলবেনা, তোমার রূপের কথা তুমি নিজে কি বুঝবে ! যদি আমি বলি, ক্রান্সাকের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সুন্দরী, এর উত্তরে কি বোলবে, শুনি ?

অ্যানেট্—আমি কিছুই বোলবনা, কিন্তু আমার পর আর কাকে সুন্দর লাগে, দেখিয়ে দিতে হবে।

তর্ক বিতর্ক হবার পর সে আমায় তার সুন্দর ফুলের কেয়ারীগুলি দেখাতে সুরু কোরল ; অল্প সময়ের মধ্যে কতই যেন আপনার হয়ে গেল সে।

সন্ধ্যার আগেই বাড়ীর সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েগুলির মা'ও ছিলেন খুব সুন্দরী, সুরসিকা ও প্রাণময়ী। আমাদের এই হাস্য কৌতুক ও আলাপ আলোচনায় দার্শনিককে শুধু যোগ দিতে দেখা যেতনা।

পরের দিন সকাল বেলা চলে যাব, এই মনে ক'রে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছিলাম ; ভোর হতেই মত বদলে গেল ; যাওয়া আর হোলনা।

ফ্যানি তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিল, নানারকম মধুর জ্বালাতনে আমায়

ভুলিয়ে রাখত; আমি অনুভব করেছিলাম, কী ভীষণ ভাবে কিশোরী আমার মনের শান্তিকে ভঙ্গ কোরছে! নিজেকে কি ভাবে সংযত করে রাখতাম, অবুঝ ষোড়শী তা বুঝতোনা। পঞ্চশরের আঘাতের বেদনা সে বুঝবে কেমন করে! তার বিকশিত যৌবনের সঙ্গে মিশেছিল একটি শিশুসুলভ সরলতা।

সময় সময় মনে হোত, সে আমার প্রতি যেন আকৃষ্ট হয়েছে। আবার যখন ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা কোরতাম তখন স্পষ্টই মনে হোত যে ফ্যানীর চাহনির মধ্যে উত্তেজনা থাকা তো দূরের কথা, তার মধ্যে রয়েছে একটা প্রীতির পরিব্যাপ্তি। শিশুসুলভ সরলতায় তার মুখখানি পূর্ণ হয়ে থাকতো। শিশুরা যেমন সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশে যেতে পারে, তার আচরণও ছিল, সেই ধরণের। নারীসুলভ কোমলতা, নিষ্পাপ মন, এই সব মিলে তার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল যে কেউই তার সঙ্গে অশিষ্ট আচরণ কোরতে সাহস পর্য্যন্ত কোরতনা। নিষ্পাপ মন নিয়ে সকলের কাছে সে এগিয়ে যেত।

মাঝে মাঝে আমার মনে হোত যে অসুখী ওরনি, মেয়েটির মনকে যেন অধিকার ক'রে আছে।

দার্শনিকের বাইরেটা খুব সুন্দর, কিন্তু লক্ষ্য কোরলে বোঝা যায়, অন্তরে বিষাদের ফল্গুধারা ছুটে চলেছে। তার এই করুণ চাহনি কেমন যেন একটা আকর্ষণ এনে দেয় মনে। সদা সর্ব্বদা তার মনে একটা অস্বস্তির ঝড় বয়ে গেলে কি হবে, সৎপথ অনুসরণ কোরেই সে চোলত। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না চলতে পারলেও তার হৃদয়ে পাকা সোনার কস্ ধরানো ছিল।

একবার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখতে পেলাম, ফ্যানি ভদ্রলোকের আলুথালু চুলগুলি ওপরের দিকে সরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে কপালের

কোঁচকানো রেখার ওপর স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে ; দার্শনিক অন্যদিকে চেয়ে আপনার মনে সেটা উপভোগ কোরছেন। আমি মেয়েটির আচরণে একটু ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম।

মেয়েটির মন এমনই নিষ্কলুষ ছিল যে মিঃ আলব্রেট্ ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরতে একটু মাত্র বিচলিত না হয়ে দার্শনিককে একই ভাবে সেবা করে যাচ্ছিল। তার এই আচরণে আমরা না হেসে থাকতে পারলাম না।

দার্শনিকের চলে যাবার কথা উঠলে এতটুকুও বিচলিত না হয়ে কিশোরী তাকে উপদেশ দিয়ে বোলত, "ক্যাপটেনের সঙ্গে স্পেনে চলে যাও বন্ধু, তোমার কাছে সেটা স্বর্গের সমান মনে হবে। যা হোক, সেখানে মানুষ-বিদ্বেষী লোকের মাঝে মন্দ লাগবে না। এখানকার লোকেদের হাত থেকে নিষ্কৃতি তো পেয়ে যাবে।"

তার বোন অ্যানেটের মধ্যে শিশুসুলভ সরলতা ও প্রাণশক্তি বড় কম ছিলনা। অনুভব শক্তি তার মধ্যে ছিল সবচেয়ে বেশী। সরলা হলেও আত্মসম্মান জ্ঞানও বড় কম তার ছিলনা।

কারুর চোখে ফ্যানিকে হয়তো আরও সুন্দর লাগতো, কিন্তু দুজনের মধ্যে সত্যিকারের কে যে বেশী সুন্দরী অনুমান করা বেশ শক্ত ছিল।

অ্যানেট্ আমার ওপর বেশ একটু আকৃষ্ট ছিল কেন, জানিনা। ওরনির অস্বাভাবিক মেজাজকে সে বরদাস্ত কোরতে পারত না।—ওদের মনের সঙ্গে আমার মোটেই খাপ খায়না। অ্যানেট্ আমায় অভিযোগ কোরত। শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে মনের গোপন কথাগুলি সে আমায় বলে যেত। কি ধরণের পোষাকে তাকে মানাবে সবই আমায় পছন্দ ক'রে দিতে হোত। তাকে আমার এত ভাল লাগত, বলতে পারিনা। যাবার কথা তুললে অ্যানেট্ এমন একটা মিনতির স্বরে আমায় বাধা দিত যে সে কথা বন্ধ না ক'রে উপায়ই ছিল না।

ওরনি এসে আমায় আরও সাতদিনের জন্য থাকতে অনুরোধ করাতে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলাম।

—অ্যানেট্ কি আপনার যাবার পথে বাধা দিচ্ছে?

একথা আর না ব'লে থাকতে পারলাম না।

"ঠিক বলেছেন", এই কথা বলে তাঁর হাস্যমুখর ভাবটী গোপন রাখার জন্য মুখটী হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন।

দার্শনিক— জানেন, যাবার কথা শুনে অ্যানেটের চোখদুটী জলে ভরে এল, মত না বদলে পারলাম না। মেয়েদের চোখে কি যে যাদুমন্ত্র আছে, জানিনা। ছোট ডাইনিটী আমাকে এখানে আরো আটদিন থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছাড়লো। আমার কথা পেয়ে তার কি আনন্দ! খুসীর হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে লতার মত দুটী হাতে গলা জড়িয়ে ধরে আমার গালে একটা চুম্বনও এঁকে দিলে। জলভরা মেঘ সরে গেলে আকাশ যেমন আলোর খেলায় মেতে ওঠে, তার খুসীর হাসিতে ঘরের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল।

আমি বোললাম, বুঝেছি, এরকম অমূল্য সম্পদ পেলে সন্ন্যাসীকেও মানুষ ভুলে যায়।

দার্শনিক—এখন আপনার যা ইচ্ছে তাই কোরতে পারেন। কথা দিয়েছি, আমাকে এ ক'দিন থাকতেই হবে; তবুও একথা বোলছি, আপনার সঙ্গে পারপিগ্নানে যেতে পারলে খুবই আনন্দলাভ কোরব।

দার্শনিকের সঙ্গ পাবার লোভে আমাকে আরও একসপ্তাহ থেকে যেতে হোল। এই সামান্য বিশ্রামেই আমার মন সুস্থ হয়ে গেছে।

জয়ের আনন্দে অ্যানেট্ নাচতে নাচতে আমার দিকে এগিয়ে এসে বোলল, "বলুন আমরা ওরনির মত বন্য লোককেও পোষ মানাতে পারি,

কি বলেন ?” কথা বলবার সময় ঝর্ ঝর্ ক’রে তার হাসি ঝরে পড়তে লাগল।

বোললাম—বেশ বুঝতে পারছি, যে অস্ত্রে তাকে জখম করেছ, আমাকেও তা করতে পার।

আগ্রহের সঙ্গে আমার দিকে চাইতেই তার মুখ লজ্জায লাল হযে উঠলো ; গুন্ গুন্ করে একটা গানের সুর ধরে নাচতে নাচতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইভাবে আটদিন কেটে যায়, আমি ভাবতে লাগলাম,—এই সুন্দর পরিবারের মাঝখানে থেকে হোল কি. ভালবাসার বন্ধনে এদের সঙ্গে জড়িয়ে পোড়লাম নাকি ? ফ্যানীর সৌন্দর্য্য একটা গভীর রেখা টেনে দিল আমার স্মৃতির পটে। ছোট মেয়েটীকে আমি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলাম। ভালবাসার মধ্যে যে মাদকতা অবুঝ মেয়ে তা বুঝবে কি !

বয়সে আমি ও ওরনি তো প্রায় সমান হব, কিন্তু তার প্রতি মেয়েটীর এত আকর্ষণ কেন ? আমি স্বীকার কোরছি, এখনও পর্য্যন্ত কোন মেয়েকে আত্মসচেতন হযে ভালবাসিনি। ফ্যানিই আমার মনে প্রথম সোনার কাঠি বুলিয়ে দেয। আত্মসংযম ক’রে আমায় চলতে হয, পাছে অশোভন একটা কিছু করে বসি। যাবার দিন এগিয়ে আসছে ভেবে আনন্দ হচ্ছিল, কিন্তু এর সঙ্গে বিষাদের ছিটে ফোঁটা মিশে গিয়ে একটা আলোড়ন এনে দেয় মনের মধ্যে।

যাবার দিন পর্য্যন্ত গৃহকর্ত্রী আমাদের তুজনের সঙ্গে মধুর ব্যবহার ক’রে গেলেন। যাত্রার সময় ওরনিকে একটুও বিচলিত হোতে দেখা গেলনা। যাবার দিনে ফ্যানীকে দেখে আমার মনে হযেছিল, তার রূপান্তর ঘটেছে। আমাদের বিদায়ের সময় খুব সহজভাবে ফ্যানী অভিনন্দন জানালো।

অ্যানেট্‌কে দেখে বোঝা গেল, সে বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার হাতখানিকে কিছু সময়ের জন্য ধরে হঠাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে; তারপর একটা ফুটন্ত গোলাপ এনে আমার হাতে দিল। আরেকটা হাতে আমার দেওয়া শুকনো গোলাপটি সে ধরে ছিল। বিষাদে অ্যানেটের মুখখানি ভরে আসে, একটা কথাও বেরোয় না।

আমি যেই তার হাতখানি নিয়ে তাতে একটা বিদায় চুম্বন দিয়েছি, অমনি সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। এই প্রথম ফ্যানি ও তার মায়ের চোখে জল দেখতে পেলাম।

আর বিলম্ব না ক'রে বিদায় নিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠে পোড়লাম। গাড়ী চলতে আরম্ভ কোরল। ওরনির মুখটা বিষাদে ভরে গিয়েছিল; আমি কিন্তু আনন্দচিত্তেই তার পাশে বসেছিলাম। মাঝে মাঝে ফ্যানির অশ্রুসিক্ত মুখখানি অন্তরে ভেসে উঠছিল।

হঠাৎ এই মৌনতা ভঙ্গ ক'রে দাশনিক আরম্ভ কোরলেন, "কি বড়লোকের প্রাসাদে, কি চাষাদের কুটীরে মানুষ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কেন, বুঝতে পারি না। সম্ভবতঃ আমিই সকলের কষ্টের কারণ। জানেন, সকলে আমায় কষ্ট দেয় বলেই বাধ্য হয়ে আমাকেও ওই রকম হতে হয়।"

আমি বোললাম,—সুন্দরী ফ্যানি নিশ্চয়ই আপনার কষ্টের কারণ হয়নি, আশা করি?

দার্শনিক বোললেন,—আপনার কথা অস্বীকার কোরতে পারি না, যদিও জানি, এ পৃথিবীতে শিশুরাই তো আমাদের মত দুঃখ জর্জ্জরিত আত্মার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল—এই ফ্যানির কথাই ভাবি, কি সুন্দরই মেয়ে না সে! ওকে আমি ইচ্ছে ক'রে এড়িয়ে চলি। ক্রান্সাক্‌

জায়গাটা আমার খুব ভালই লেগেছিল; হয়তো আরও কিছুদিন থাকতাম; কিন্তু সত্যি কথা বোলতে কি, ওই ফ্যানির জন্য আর আমার ওখানে থাকা হোল না।

আমি বোললাম,—আপনার কথাগুলো হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হচ্ছে।

ওরনি—মোটেই না, আপনাকে পরিষ্কার ক'রে বলছি। আমি শুধু এই ভাবি যে এতদিন ধরে যে জ্ঞান আমি সঞ্চয় করেছি, ওই মেয়েটির সংস্পর্শে হয়তো সবই নষ্ট হয়ে যাবে; মানসিক কষ্ট হয়তো আরো বেড়ে যাবে।

আমি দার্শনিকের কাছে আলব্রেট্ পরিবার সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন কোরলাম, কিন্তু তিনি খোলাখুলিভাবে তেমন কিছু বোললেন না।

আমার সঙ্গে আলোচনার সময় দার্শনিক ভদ্রলোকটী বোললেন, "ভাবছি, প্রথমে যাব মার্সেল্সে, সেখান থেকে যেতে হবে ইটালীতে।"

রাত্রি নিস্তব্ধ। দুজনে গাড়ীর মধ্যে বসে; চাঁদের আলোয় চারিদিক ছেয়ে গেছে। গাড়ীর জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অরণ্যপরিবৃত গগণচুম্বী পর্ব্বতের শ্রেণী।

দার্শনিক হঠাৎ জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে গ্রামগুলির দিকে তাকিয়ে কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "পাহাড়ের ওপর ওই ভাঙ্গা বাড়ীটা কার, বলতে পার?"

কোচ্ম্যান—ওটা লুবের কেল্লা।

ওরনি—ওর পাশ দিয়ে সিজিযানের রাস্তা চলে গেছে, না?

কোচ্ম্যান—ঠিক বলেছেন।

দার্শনিক—আচ্ছা, আমরা বেলকের খুব কাছে এসে পড়েছি, না?

ক্যোচ ম্যান —আজ্ঞে, হ্যাঁ।

দার্শনিক গাড়ীর কোণে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে প'ড়ে রইলেন।

আমি নিবিষ্টচিত্তে সেই দুর্গের দিকে তাকিয়ে রইলাম ; বিরাট দুর্গটা অরণ্য ভেদ ক'রে দাঁড়িয়েছিল ; মনে হচ্ছিল, স্থানটা যেন রহস্যময়।

—কেল্লাটার অবস্থা কতদিন থেকে এই রকম হয়েছে ?—আমি কোচ্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা কোরলাম।

কোচ্‌ম্যান—আমি যতদূর জানি, দশ বছর আগে অধিবাসী সমেত কেল্লাটা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

বোললাম—কি ভয়ানক কথা ! এ ব্যাপারটা কিভাবে ঘটলো ?

কোচ্‌ম্যান—কেন, বিদ্রোহে দেশ মেতে ওঠবার ঠিক আগেই দেশের লোকেরা একজোট হয়ে কেল্লার গেট ভেঙে ঢুকে জিনিষপত্র, আসবাব সব পুড়িয়ে একাকার ক'রে ফেলে ; তার সঙ্গে কেল্লার কাউণ্টেসকেও তারা পুড়িয়ে শেষ করে দেয়, কারণ অত্যাচারের জন্য সকলেই তাকে ঘৃণা কোরত।

—মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে,—হঠাৎ দার্শনিক চীৎকার ক'রে বলে ওঠে।

কোচ্‌ম্যান দেখুন এসব কথা আমি খুব বিশ্বস্ত লোকেদের মুখে শুনেছি আরও বোলেছে, আগুন লাগার সময় কাউণ্টেসের একমাত্র ছোট শিশুটীও পুড়ে মারা যায়।

—তারা মিথ্যা কথা বোলেছে,—ওরনি উত্তর দেয়।

আমি বোললাম, —তাহ'লে, ওই কেল্লার ইতিবৃত্ত আপনার জানা আছে ?

ওরনি—যে ছেলেটীর পুড়ে মারা যাবার কথা আপনি শুনলেন, সে হলুম আমি নিজেই, আর কেউ নয়।

বোললাম,—আপনি তা'হলে ওই কেল্লায় যারা থাকতো, তাদের বংশধর !

"আমি কারুর সন্তান নয়",—বিচলিত হয়ে ব'লে ওঠে ওরনি।

বোললাম,—কিন্তু একটু আগেই আপনি বোললেন যে······

—হ্যাঁ, সত্যি কথাই, এর মধ্যে তর্ক করার কিছু নেই,—ব'লে ওঠে ওরনি।

একটু পরেই দার্শনিক আরম্ভ করে,- পনের বছর বয়স পর্য্যন্ত গ্রামের পাদরী সাহেবের কাছে আমি মানুষ হই। প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি আমার কোন নিকট আত্মীয় অথবা বাবাই হবেন। আমার ধারণা ভুল হয়েছিল ; পরে জানতে পারলাম আমি অন্য লোকের সন্তান। চার বৎসর বয়স থেকে আমাকে তাঁর কাছে রেখে দেওয়া হয়। আমাকে মানুষ করবার জন্য প্রচুর অর্থ তাঁর কাছে আসত।

বাবা মার সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরলে তিনি বোলতেন, "খোকা তুমি বড় বেশী কথা বল। শোন, তোমার বাবা মা অনেকদিন হোল মারা গেছেন। ভাবনা কি, তোমাকে মানুষ করার ভার আমার হাতে তাঁরা দিয়ে গেছেন।"

ভদ্রলোককে মনে মনে শ্রদ্ধা কোরতাম।

কোন একটা ভালবাসার বস্তুকে কেন্দ্র কোরতে চাইত ; শিশুর মন তো।

ভদ্রলোক নিজের মনের মত ক'রে আমায় শিক্ষিত ক'রে তুলছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিজ্ঞান ও কয়েকটী ভাষা বেশ ভাল ক'রে শিখেছিলাম। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্যে তিনি আমায় টাউনহাউসে নিয়ে যান। কিছু দিনের মধ্যেই হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। পৃথিবীতে আমাকে দেখবার আর কেউ রইল না। ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে আমার নামে টাকা জমা রেখে-

ছিলেন, সেখান থেকে নিয়মিতভাবে খরচের টাকা আমার হাতে আসতো। এই অর্থলাভের জন্যে ভদ্রলোকের কাছে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে কোরতাম। পরে শুনতে পেলাম, প্যারিসের কয়েকটী ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমার নামে টাকা এসে ব্যাঙ্কে জমা হয়।

তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছি। একটা রোমাঞ্চকর ভাব এসে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে স্পন্দন জাগাত। আমি একটু কাল্পনিক প্রকৃতির ছিলাম. কবিত্বে মনটা সব সময় ভরপুর হয়ে থাকত। অনুভব কোরতাম, পৃথিবীটা যেন রূপ, রস, গন্ধে ভরে গিয়েছে। কল্পনার রঙ্গীন স্বপ্নে মন বিভোর হয়ে থাকত। প্রচুর অর্থ হাতে ছিল, তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে নিজের ইচ্ছামত দিন কাটাতে পারতাম।

আমার একজন বান্ধবী ছিল, যাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ভাল-বাসতাম। জীবনে এই প্রথম আমি অনুভব করেছিলাম, ভালবাসার আদান প্রদানের কি মূল্য। জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগের লালসা আমায় পেয়ে বসেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সেই সুখস্বপ্ন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল।

আমার প্রিয়তমা ছিল সৎবংশের মেয়ে। তাকে সম্পূর্ণভাবে সুখী কোরতে চেয়েছিলাম। এক বন্ধুকে দিয়ে আয়ের অধিকাংশ ভাগ তাকে পাঠিয়ে দিতাম। বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলাম, আমার এই সাহায্যের কথা যেন কেউ না জানতে পারে। কল্পনাও কোরতে পারিনি যে আমার বন্ধু প্রতারণা ক'রে মেয়েটীর মন নিজেই দখল ক'রে নেবে। আমার অর্থ, সে তো আত্মসাৎ করেইছিল, তার ওপর আমার প্রিয়তমার টাকা নিয়েও সে ছিনিমিনি খেলতো। নির্বোধ কিশোরীর জন্য আমার মনে করুণার সঞ্চার হোত।

হতাশায় মন ভরে যায়। এই ঘটনার ঠিক পরেই অসুখে আমার

শরীর ও মন জর্জ্জরিত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকের মুখ দর্শন করা পাপ। এই ঘটনার পর থেকে তাকে আমি পরম শত্রুর মত জ্ঞান কোরতাম। একদিন সকলের সামনে সে আমায় অপমান করে। রাগের মাত্রা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তার হাতে গুলি পর্যন্ত চালিয়েছিলাম। আহত হয়ে সে আমায় অভিসম্পাত করেছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একটী ভদ্রলোক এসে আমার হাতে একটা বন্ধ মোড়ক দিয়ে বোললেন, "এর প্রাপ্তি স্বীকার ক'রে আমায় একটা রসিদ দিন।"

প্যাকেটটা নিয়ে সই ক'রে দিলাম। তিনি আবার সুরু কোরলেন, "মিঃ ওরনি, লুবের কেল্লায় কাউণ্টেসের কাছে গিয়ে আপনি যে তার সন্তান এই দাবী করুন। আসলে কাউণ্টেসই আপনার মা। সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ডে আপনার বাবা মারা গেছেন। সে খবরও এর মধ্যে আছে। আগে সব খরচ তিনিই আপনাকে দিতেন। আমাকে তিনি জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে আপনার সমস্ত খরচ কাউণ্টেসকেই বহন কোরতে হবে।" কথাটা শুনে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "আমার মা কোথায়, কোথায় গেলে আমি তাঁকে পাব?"

আগন্তুক ভদ্রলোকটী জানালেন যে আমার মা আঠার বছর প্যারিসে ছিলেন, তারপর কোন একটা পারিবারিক ব্যাপারে তাঁকে লুবের কেল্লায় আসতে হয়। আগন্তুক ভদ্রলোকটী আমার মৃত পিতার তরফ থেকে এসেছিলেন। তিনি তাঁর কর্ত্তব্য শেষ ক'রে চলে গেলেন।

চিঠি থেকে আমার মা, বাবার সম্বন্ধে সঠিক কিছু ধারণা কোরতে পারলাম না। ভাবলাম, আমাকে তাঁরা সন্তান ব'লে স্বীকার কোরতে এত বিলম্ব কোরছেন কেন? মোড়কের মধ্যেকার চিঠি থেকে বুঝে-

ছিলাম, চার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে একজন চাষার ঘরে রাখা হয়। শ্রদ্ধেয় পাদরী মশাইএর লেখা চিঠি ও অন্যান্য কাগজ পড়ে যদিও বুঝতে পারিনি, আমি বৈধ সন্তান কিনা, তবুও তার মধ্যে আমার জন্মবৃত্তান্ত সবই পেয়ে গেলাম।

ভাবলাম, ধর্ম্মযাজকের মধ্যে সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষীকে হারিয়ে মাকে তো পেলাম।

ভদ্রলোকেব সঙ্গে বাস করবার সময অনেকবার কাউণ্টেসের কথা শুনেছি। সুন্দরী হয়েও তিনি ছিলেন অভাগিনী। আমার মনে হোত, তাঁর এই অশান্তির কারণ তো আমিই।

এই রকম চিন্তা কোরতে কোরতে দুর্গে পৌছেই আমার আগমনের সংবাদ জানালাম; যাবার পথে কেবলই মনে হচ্ছিল, কি ব'লে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পোড়ব। ভাবলাম, হঠাৎ হারানো ছেলেকে দেখে, আনন্দে অভিভূত হয়ে যদি তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়।

তাঁর ঘরের মধ্যে গেলাম; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য্যে সত্যিই মনের মধ্যে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার করে। তাঁর সৌন্দর্য্য দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এর রক্ত মাংসেই না আমার শরীর গ'ড়ে উঠেচে। উনচল্লিশ বৎসরের থেকে তাঁকে অনেক ছোট দেখাচ্ছিল। অশ্রুপূর্ণ চোখে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম; আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে মন এত ভরে গিয়েছিল যে একটা কথা পর্য্যন্ত মুখ থেকে বেরুতে চাইছিল না। তাঁর পায়ের নীচে লুটিযে পড়ে, কোন রকমে আমার নামটা উচ্চারণ কোরে বোললাম,—হারান ছেলের কথা ভেবে আপনার মনে একটুও কি কষ্ট হয়নি?

তিনি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন,—যুবক তুমি ভুল বুঝেছ। যাকে তুমি খুঁজছো, আমিই সেই কাউণ্টেস্, এটা সত্যি কথা। শুনলে আশ্চর্য্য

হবে, আমার বিয়েই হয়নি। লোকেরা আমার চরিত্রে কলঙ্ক আনবার জন্যে এই ধরণের একটা ফন্দী করেছে।

তিনি আমায় উঠে দাঁড়াতে আজ্ঞা কোরলেন। তাঁর কথায় হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম, তাঁর মনের মধ্যে একটা আলোড়ন চলেছে; বাইরে থেকে সেটা অনুমান করা শক্ত। তিনি বিদ্রূপের সঙ্গে কথা বলে গেলেন। তাঁর আচরণে ব্যথিত হোয়ে তাঁরই হাতে লেখা কাগজগুলি সামনে মেলে ধরে বোললাম,—আপনার হাতেই তো লেখা রয়েছে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আপনার সম্পত্তি থেকে একটা মোটা ধরণের অংশ পাব; যাতে ক'রে স্বচ্ছন্দে আমার দিন কেটে যাবে। তাঁকে আঙ্গুল দিয়ে দলিলে তাঁর নিজের লেখা সই দেখিয়ে দিলাম। তাঁর চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, আমি যে তাঁর প্রকৃত সন্তান, এর কোন উল্লেখই নেই। শুধু অনুরোধ করে জানতে চাইলাম, তাঁর আসল উদ্দেশ্য কি।

আমার কথা শুনে হতভম্বের মত তিনি বোললেন,—আমারতো বিয়েই হয়নি; তোমাকে ছেলে বলে গ্রহণ করে এই বৃদ্ধবয়সে অপযশের বোঝা কাঁধে নেব, মনে কর? কাগজগুলি আমার হাতে দাও, বেশ তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা ক'রে দেখব, কি লেখা আছে এগুলির মধ্যে। আসলে তুমি কে, এটাও আমার ভাল ক'রে জানতে হবে। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থাকতে পার।

প্রথমে মনে হোল, হয়ত তিনি আমায় সন্তান ব'লে গ্রহণ কোরবেন; আবার ভাবলাম, দলিলগুলোকে হস্তগত কোরে আমাকে বঞ্চনা করবার মতলব নয় তো।

কাগজগুলি পকেটের মধ্যে ভরে বোললাম,—আপনার মনে একটুও দয়ার সঞ্চার হোলনা! ভেবেছেন, আপনার হাতে সব কাগজপত্রগুলি

দেব ? তা যদি মনে করে থাকেন, ভুল করেছেন। প্রয়োজন হ'লে আদালতে এগুলি পেশ কোরব। আপনাকে আটদিনের মত সময় দিলাম ; ভেবে দেখবেন।

তিনি নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ব্যথিত মনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি এমন সময় শুনতে পেলাম, তিনি অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে কাদের বোলছেন,—ধরে নিয়ে এস ছোকরাকে ; সাবধান, যেন দুর্গের বাইরে না যেতে পারে।

পরিচারিকারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সমস্বরে 'বলে উঠল, দারোয়ান, গেট বন্ধ কর।" আমি আর কোন দিকে না চেয়ে লোকটাকে ধরাশায়ী করে ঘোড়ার পিঠে উঠে তীরের গতিতে বেরিয়ে গেলাম। কাণ ঘেঁসে একটা গুলি ছুটে গেল, অনুভব কোরলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি, গেটের সামনে সন্ত্রস্ত হয়ে চাকরগুলি দাঁড়িয়ে আছে, আর কাউন্টেস্ ওপরের জানালা থেকে মুখ বার করে রয়েছেন।

দার্শনিক আবার বোলতে সুরু কোরলেন,—সিগিয়ানের নোংরা সরাইখানাতে, বাধ্য হয়ে আটদিনের জন্য অপেক্ষা কোরতে হোল। তৃতীয় দিনের রাত্রে একটা গোলমেলে আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যেতে লক্ষ্য কোরলাম, ঘরের সিলিংটা লাল আভায় ভরে গিয়েছে। আলোটা একটা কালো লণ্ঠন থেকে বেরিয়ে আসছিল। পাগলের মত বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কোরলাম, লণ্ঠন সমেত একটা লোক মাটিতে পড়ে গেল। অপর আরেকজন অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের ঘাড়ের ওপর পড়ে, ঘুসি চালাতে লাগলাম। এত পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম যে মনে হোল, দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাতিটা জ্বেলে দেখতে পেলাম যে সেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে

মাটিতে পড়ে আছে। অসংলগ্ন জামা কাপড়গুলি গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলাম সেই অদ্ভুত লোকটার নাক মুখ দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস বেরিয়ে আসছে। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে লোকটীর ওপর লাফিয়ে পড়ে, তার পকেটে অন্বেষণ করে একটা পিস্তল পেলাম। দড়ি দিয়ে ট্রাঙ্কের সঙ্গে আষ্টে পিষ্টে তাকে বেঁধে ফেললাম, যাতে না পালাতে পারে। জ্ঞান ফিরে আসতেই যন্ত্রণায় সে ছটফট কোরতে লাগল।

একখানা ছুরি নিয়ে তার বুকের ওপর বসে ভৎর্সনা করে বোললাম, —তুই কি চাস বল, তা না হলে তোকে মেরে শেষ ক'রে ফেলব।

কেঁপে সে বলে উঠল,—আমি টাকাকড়ি কিছুই নিতে আসিনি। কাউণ্টেসের আজ্ঞামত শুধু দলিলগুলো নিতে এসেছিলাম।

আমার অগোচরে তারা কাজ হাসিল ক'রে ফেলবে ভেবেছিল। মেঝেতে একটা মুখোস পড়ে আছে দেখতে পেলাম।

লোকটাকে যদিও আমার ঘরে বন্দী কোরে রেখেছিলাম, তবুও আতিথেয়তার দিক থেকে কোন ত্রুটি করিনি। পত্রবাহকের মারফৎ কাউণ্টেস্‌কে একখানি চিঠি দিয়ে জানালাম, যাতে তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই লোকটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করেন। ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাউণ্টেসের কাছ থেকে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে একটি লোক আমার কাছে এল।

বছরে কাউণ্টেসের কাছ থেকে পনের হাজার টাকা পাব, কয়েকজন উকিলের সামনে এই চুক্তি করিয়ে নিয়ে কাগজগুলি লোকটীর হাতে সমর্পণ কোরলাম।

তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর বুঝতে পারলাম, পৃথিবীতে আর আপনার বোলতে কেউ রইল না। শৈশবের বন্ধু আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা কোরল ; প্রিয়তমা আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রে দূরে সরে গেল ;

মাও পর্য্যন্ত আমাকে সন্তান ব'লে স্বীকার কোরলেন না। এইগুলিই হোল আমার জীবনের ইতিবৃত্ত। . .

এই ধরণের আলোচনা কোরতে কোরতে আমরা একটী ছোট সহরে এসে পৌঁছলাম। রাত্রিটা সেইখানেই কাটান গেল। পরের দিন সকালে প্রাতঃরাশের সময দার্শনিক আমাকে সম্বোধন কোরে বোললেন,—জানেন তো, এবারে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রথমে আমাকে মারসেল্‌সে যেতে হবে; সেখান থেকে যাব ইটালীতে।

আমি বোললাম,—মিঃ ওরনি, কেন জানিনা, আপনার জন্য সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গিয়েছে। যদি আমার দ্বারা কোন রকমের একটু সাহায্য হয়, আমি প্রাণ দিয়ে তা আপনার জন্য কোরতে প্রস্তুত। আমার দুর্ভাগ্য যে সামান্য একটা উপদেশ ছাড়া আর কি দিয়ে আপনাকে সাহায্য কোরতে পারি?

মিঃ ওরনি—আপনি স্বচ্ছন্দে উপদেশ দিতে পারেন।

বোললাম—এতগুণের অধিকারী হয়েও আপনি অসুখী, এ কথা ভেবে সত্যিই আমার প্রাণে কষ্ট হয়। আপনার মধ্যে সত্যিকারের মানুষটাকে লোকে দেখতে পায় না। বেশ বুঝতে পারি প্রিয়জনেরা আপনাকে প্রতারণাই করে এসেছে। সামান্য কয়েকজন লোকের অসৎ ব্যবহারের জন্যে আপনি সারা পৃথিবীর লোককে কিন্তু দোষী কোরতে পারেন না। এই রকম বিমর্ষচিত্তের পরিবর্ত্তে খুসী মনে সকলের সঙ্গে মিশলে, হয়ত এতদিনে আপনার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জুটে যেত। আমার মনে হয় মারসেল্‌স্ অথবা ইটালিতে না গিয়ে আপনার ক্রানসাকে যাওয়াই শ্রেয়। বলে রাখছি দেখবেন্, আলব্রেট্ পরিবারের মধ্যে থেকে আপনার মন সুস্থ হয়ে উঠবে। সেখানে আপনার দুর্ব্বলতা নিয়ে কেউ উপহাস না করে আপনার গুণেরই সমাদর কোরবে। বন্ধুর মতই এ কথাগুলি দার্শনিককে

আমি বলে গেলাম। দার্শনিক আমাকে গাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

"আপনার ব্যায়রামের ওষুধ ক্রাণসাকে রয়েছে।" এই কথাটী বলে আমি গাড়ীতে উঠে পোড়লাম।

পারপিগনানে পৌঁছে সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানতে পারলাম যে আমার সৈন্যদল দুদিন পূর্ব্বেই ক্যাটালোনিয়ার পথে যাত্রা কোরেছে। এর কিছু পরেই সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে শুনতে পেলাম যে সম্রাট আমাকে মেজরের সম্মানে ভূষিত করেছেন। তারপর ক্যাটালোনিয়ায় গিয়ে নিজেও সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরলাম। দু'বছর যুদ্ধ চ'লল। প্রত্যেক দিনই আমাকে যুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে হোত। জায়গাটীর অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুর জন্যে আমাকে খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হোল। মাঝে মাঝে ক্রানসাক ও ফ্যানীর কথা মনে আসছিল। সেখানকার লোকজনের সঙ্গে আমার মোটেই মনের মিল হোত না। এই অপ্রীতিকর স্থানে শুধু আল্‌ব্রেট্‌ পরিবারের কথা স্মরণ ক'রে কিছুটা শান্তি লাভ কোরতাম।

এইভাবে দু'বছর কেটে যায়। একদিন ট্যারাগোনা'র প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ একটা গুলি এসে আমাকে ধরাশায়ী কোরে দেয়। এই দুর্ঘটনার কয়েকদিন আগেই আমি লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেলের পদে উন্নীত হই। ট্যারাগোনার দুর্গ কামানের গোলায় উড়ে যায়, একটা গুলি এসে আমার একটা পা'কে বিদ্ধ করে, শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাতের জন্য আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। বুঝতে পারলাম হয়ত আমার সৈনিক জীবন শেষ হয়ে গেল। দুজন সার্জ্জেনের মধ্যে আমার পা অস্ত্রোপচার করা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয়ে গেল। প্রথম জন বোললেন,—পা কেটে না ফেললে রুগীর মৃত্যু নিশ্চিত;

দ্বিতীয়জন জবাব দিলেন,—অস্ত্রোপচার না করেই রুগীকে বাঁচান যাবে। শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হোল না; আমি বেঁচে গেলাম। পেনসন্ নিয়ে কোথায় যাব চিন্তা কোরতে লাগলাম। ডাক্তারেরা ঝর্ণায় স্নান কোরতে উপদেশ দিলেন।

প্রথমে ভাবলাম, আমার দেশে পৈত্রিক সম্পত্তির দখল নিতে যাবো; আবার চিন্তা কোরলাম যে সম্পত্তি তদারকের জন্য একজন নিকট আত্মীয় তো রয়েছেন। শেষে মনে হোল ক্রানসাকে গেলে মন্দ হয় না। ফ্যানী সুন্দরীর নিশ্চয়ই এতদিনে বিয়ে হয়ে গেছে। এতদিনে আল্‌ব্রেট্ পরিবারের কতই না পরিবর্ত্তন হয়েছে। ফ্যানীকে আমি ভাল-বেসেছিলাম, কিন্তু সে তো তার কোন প্রতিদান দেয়নি। সেখানে গেলে যদি আবার মনের শান্তি ভেঙ্গে যায়, কি হবে? হয়ত ফ্যানী মরে গেছে, না, না, সেখানে যাওয়া হবে না। এই রকম নানা চিন্তায় আমার মন ভরে যায়। যতই ভাবি ততই আল্‌ব্রেট্ পরিবারের ছবিখানি আমার অন্তরে ভেসে ওঠে, শেষে ক্রানসাকে যাওয়াই ঠিক কোরলাম।

আমার বিশ্বস্ত ডাক পিয়ন টমাসকে সঙ্গে নিয়ে ক্রানসাকের পথে রওনা হোলাম। কদিন গাড়ীতে করে যাবার পর দূরে, ক্রানসাকের বাড়ীগুলি দেখতে পেয়ে বিচলিত হয়ে উঠলাম। একবার মনে হোল ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। আবার একটা কাল্পনিক দুর্ঘটনার ছবিও আমার অন্তরে ফুটে ওঠে। গাড়ীটা পরিচিত সরাইখানার কাছে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা দুরু দুরু করে উঠলো। এ দিনটা রবিবার, শুধু ফ্যানী ছাড়া আলব্রেট্ পরিবারের সকলেই চার্চ্চে গেছে। গাড়ী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরী এসে অভ্যর্থনা কোরল; আমি তাকে দেখে একটু অবাক হয়ে ভাবলাম, না এ তো ফ্যানী নয়। মনে হোল, ফ্যানী থেকে ক্রমবিকাশ লাভ করে এ যেন স্বর্গীয় পরীতে পরিণত

হয়েছে। মনে মনে বোললাম,—না এ তো দেখছি বিশ্ব-শিল্পী তুলি দিয়ে নিখুঁত ক'রে এ প্রতিমাটী এঁকেছেন। সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিতে আমার মন বিভোর হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়, এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর অশরীরী ছায়া এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

আমি মুগ্ধ নেত্রে সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু কোরলাম।

কিশোরী বন্ধুর মতই আমাকে অভ্যর্থনা কোরে, মনোমুগ্ধকর হাসিতে একটা সুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরল।

"কি সুন্দরই না তোমায় দেখতে হয়েছে! আমার কথা কি তোমার মনে পড়ে?"—আমি বোললাম।

"আপনি কি ভাবেন আমাদের স্মৃতিশক্তি এতই খারাপ? বোললে হয়ত বিশ্বাস কোরবেন না, গতকাল সন্ধ্যায় আপনার সম্বন্ধে আমাদের ভেতর আলোচনা হচ্ছিল। ভেবেছিলাম, এতদিন খবর নেই আর বোধ হয় কখনও দেখা হবে না। আশ্চর্য্য, আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে আপনি সশরীরে এসে উপস্থিত হোলেন! কি করে এলেন? মনের কি বিচিত্র গতি! মনেপ্রাণে কামনা কোরলেই বোধ হয় সব জিনিষই পাওয়া যায়,"—তরুণী বোললে।

আমি সুন্দরীর হাতের চম্পক-অঙ্গুলিতে ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়ে বোললাম, "আমি কি এসেছি? তোমার এই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আমায় টেনে এনেছে! স্পেনে যদি আমার মৃত্যুও হোত তা'হলেও আমার অশরীরী আত্মা তোমার চারপাশে এসে ঘুরে বেড়াত।"

"সত্যিই তা'হলে আমার এত ক্ষমতা!"—দুষ্টুমিভরা হাসির সঙ্গে কিশোরী জবাব দেয়।

"এখানে স্বর্গের নীড় রচনা ক'রে থেকে যাই। বল, মত আছে

কিনা? সত্যি বলতে কি সুন্দরী, তোমাকে ছেড়ে যাবার পর থেকে একটুও শান্তি পাইনি মনে,"—আমি বোললাম।

"আপনি দেখছি শাপভ্রষ্ট দেবতার মত পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছেন,"—কিশোরী বলে।

"তোমার স্নেহের স্পর্শ দিয়ে আমার মনের ব্যাধিকে সারিয়ে দাও! আমি ভাল হয়ে উঠব; সেই প্রলোভনেই না তোমার কাছে ছুটে এসেছি! তুমি পায়ে করে না ঠেললে এখান থেকে বিদায় নেব না। সত্যি আমায় কি এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে?"—আমি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কোরলাম।

"বেশ, আপনার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যাব; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলে তারপর দেখা যাবে। আমার সন্দেহ হয়, স্প্যানিশ সুন্দরীদের অন্তরে কি রকম মণিমুক্তার খনি যে রয়েছে, তা আপনার বোধ হয় জানা নেই,"—সুন্দরী ছন্দিত গতিতে বলে যায়।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ও মিসেস্ আলব্রেট্ মেয়েদের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে, আমার সঙ্গে করমর্দ্দন কোরলেন। আমি তাঁদের কাছে ফিরে আসার কারণ ব্যক্ত কোরতেই সকলের মুখ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। মেয়েরা আমাকে ঘিরে ফেলে। অ্যানেট্কে না দেখতে পেয়ে আমি বেশ বিচলিত হয়ে উঠলাম। আমার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে মিঃ আলব্রেট্ বোললেন, "কাকে খুঁজছেন আপনি, শুনতে পারি কি?"

বোললাম—একজনকে শুধু দেখতে পাচ্ছি না।

মিসেস্ আলব্রেট্—ও বুঝেচি, জুলিয়েট্ যাও, ছুটে গিয়ে ফ্যানীকে ধরে নিয়ে এস। আপনাকে দেখে কতই না খুসী হবে সে।

তা'হলে অ্যানেট্কেই কি ভুল ক'রে ফ্যানী মনে করেছি। চারটী বসন্ত তার ওপর দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে তাকে আঠারো বছরের সুন্দরী

তরুণীতে পরিণত কোরেছে। অ্যানেট্ আমাকে দেখে গম্ভীর হয়ে যায় কেন, বুঝতে পারি না। অ্যানেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, "শরীর বুঝি ভাল নেই তোমার?"

অ্যানেট্ আমার কথা শুনে জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে আনে। মেয়ের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে মিসেস্ আলব্রেট্ তাকে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে আসতে আদেশ করেন।

"আপনার এই আকস্মিক আগমনে আমার মেয়ে বেশ চমকে গেছে, আপনাকে দেখে ফ্যানীরও ওই অবস্থা হবে মনে হচ্ছে। যাতে সে বিচলিত না হয়, আমাদের সে ব্যবস্থা কোরতে হবে। চমকে গেলে মুস্কিলের কথা। জানেন, কয়েক মাস পরেই হয়তো আমাকে দিদিমার স্থান অধিকার কোরতে হবে।"

"আপনি কি বলছেন? ফ্যানীর কি সত্যিই বিয়ে হয়ে গেছে?"—আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি।

"আপনাকে কি আগে আমরা কেউই জানাইনি যে তিন চার বছর আগেই ফ্যানীর বিয়ে হয়ে গেছে?"—মিসেস্ আলব্রেট্ উত্তর দেন।

বোললাম—শেষকালে সেই মানুষবিদ্বেষী লোকটীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন?

মিঃ আলব্রেট্—তাই তো দিয়েছি, কিন্তু জানেন, সেই অদ্ভুত লোকটাকে আমার মেয়ে একেবারে বদলে দিয়েছে। তার আচার ব্যবহার একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। ওরনি এখানে একটা চমৎকার বাড়ী কিনে তাতে বরাবরের জন্য বাস কোরবে ঠিক করেছে, কারণ আমি ঠিক করেছি, আমার কোন মেয়েকে ক্রান্সাক্ ছেড়ে যেতে দেব না।

আমি—দেখুন, আমি বলছিলাম, ফ্রান্সাকে কি আরেকটা ওই ধরণের বাড়ী কিনতে পাওয়া যাবে না ?

মিঃ আলব্রেট্—হ্যাঁ, এখানে আরও একটা নতুন বাড়ী বিক্রি আছে, এই নিয়ে আমরা কিছুদিন আগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা কোরে-ছিলাম। অ্যানেট্‌কে জিজ্ঞাসা করুন, এ খবর আপনাকে সে ভাল কোরেই দিতে পারবে।

আমি মেয়েদের সঙ্গে আবার নতুন ক'রে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিলাম, কারণ বর্ত্তমানে তারা বেশ বড় হয়ে গিয়েছে, আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটা সলজ্জভাব তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

খানিক পরে দেখি, ওরনি এক সুন্দরী কিশোরীর হাত ধরে আমার দিকে এগিয়ে এলো, তার হাতে ছিল টুক্‌টুকে একটী ছেলে। কিশোরীকে দেখে বুঝতে পারলাম, এ ফ্যানী ছাড়া আর কেউ নয়।

আমাদের পরস্পরের মধ্যে অভ্যর্থনার বিনিময় হয়ে গেল।

মিঃ ওরনি—আপনার কাছে আমি সত্যিই ঋণী ; দয়া ক'রে একবার আমার বাড়ীতে অতিথি হবেন। আপনার উপদেশে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। ইতালীর পরিবর্ত্তে আমাকে ফ্রান্সাকে আসতে আপনিই উপদেশ দিয়েছিলেন, একথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। এখানে অসুখের প্রকৃত ওষুধ আমি পাব, একথাও আপনি আমাকে জানিয়ে-ছিলেন। ইতালীতে গিয়ে আমার কোনই সুবিধা হয়নি, তারপর ফ্লোরেন্সে গিয়ে আপনার কথা মনে হোতেই আমি ফ্রান্সাকে ফিরে এসে সত্যিকারের ওষুধ পেলাম।

কথা শেষ কোরেই দার্শনিক ভদ্রলোক তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর মুখ চুম্বন কোরলেন।

“ওর কথা একটুও বিশ্বাস কোরবেন না, কর্ণেল। মাঝে মাঝে মুখ

ভার করে আমায় শুধু বলে, এখানকার ওষুধ মোটেই ভাল নয়, ভয়ানক তেতো”,—সুন্দরী ফ্যানী ব’লে যায়।

ওরনি আমাকে তার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ কোরল। আলব্রেট্ পরিবার প্রতি রবিবারেই দার্শনিকের বাড়ীতে আসতো। ওরনি মাকে তার বাড়ীতে নিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে ঝগড়ার মীমাংসা হয়ে গেছে ওরনির বিবাহের ঠিক পরেই ; ফ্যানীর অনুরোধে মাকে সে নিয়ে আসে। কাউন্টেসের সঙ্গে কর্ণেলেরও পরিচয় হয়ে গেল। মহিলার সঙ্গে কথা বোললেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি সত্যিই বিদুষী। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, কাউন্টেসের মন শান্ত ও স্থির হয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে একটা ধর্ম্মভাব এসে তাঁকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

টেবিলের পাশে উপবিষ্ট ফ্যানী ও ওরনি আমাকে ক্রান্সাকে কিছু-দিনের জন্য থাকতে অনুরোধ কোরল। মিঃ ও মিসেস্ আলব্রেটের সঙ্গে জুলিয়েট্, কেট্ ও সিলেস্টাইন যুক্ত হয়ে আমাকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করে, কিন্তু অ্যানেট্ সুন্দরী একটীও কথা না বোলে চুপ ক’রে বসেছিল। আমি আশা কোরেছিলাম, সে হয়ত মুখ ফুটে কিছু বোলবে, কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথা না পেয়ে আমার মন বেদনায় ভ’রে ওঠে। আমি খোঁড়া পায় নিরাশ না হয়ে একবার ওরনির বাড়ী যাই, আরেকবার মিঃ আলব্রেটের কাছে ঘুরে আসি। অ্যানেট্ ছাড়া আমার কাছে সকলেই অভিযোগ করে যে চার বছর গোল পাইরেনিস্ থেকে ক্রান্সাকে আমি কোন চিঠিপত্রই দিইনি।

হঠাৎ অ্যানেট্ আরম্ভ করে—কর্ণেল না থাকলে কি হবে ; তার মনটা তো এখানে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। সত্যিই যাদের মধ্যে বিচ্ছেদই হয়নি, সেখানে চিঠি দেবার তো কোন প্রয়োজনই হয় না।

এই কথায় আমি জানালাম যে বিদেশে থাকতে আলব্রেট্

পরিবারের ছবি আমি প্রায়ই কাগজ কেটে তৈরী কোরতাম ; যোগাযোগটা এইভাবেই বজায় রেখেছিলাম।

ওরনির বাড়ী দেখে আমার মনে হয়েছিল, যেন ফ্যানীকে নিয়ে সে সেখানে স্বর্গ রচনা কোরেছে। বাড়ীর ঘরগুলি প্রশস্ত, আলো বাতাসে ভরা, মার্জ্জিতভাবে সাজান, সামনেই সুন্দর বাগান।

ঝরণা থেকে স্নান সেরে আমি প্রায়ই ওরনির বাগানের ছায়া বীথিকার মধ্যে গিয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

দার্শনিককে প্রায়ই বাগানে শেওলা ঘেরা হ্রদের ধারে ফ্যানীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। মাঝে মাঝে মৃদু গুঞ্জরণে প্রেয়সীর কাণ ভরিয়ে তুলতেন।

আমি ভাবি, যদি এই রকম ধারা অ্যানেটের সঙ্গে আমিও ঘুরে বেড়াতে পারতাম তাহ'লে কি আনন্দের স্বাদই না আমি পেতাম। অ্যানেটের কথা সদা সর্ব্বদাই আমার মনে এসে দোলা দিয়ে যায়।

তিন সপ্তাহ ক্রানসাকে থেকেও অ্যানেটের কাছ থেকে আমি কোনই সাড়া পেলাম না। দিনের পর দিন আমার এইভাবে কেটে গেল, আর মনে হোল, কি যেন এক মায়ার জালে মায়াবিনী অ্যানেট্ আমাকে বেঁধে রেখেছে।

মাঝে মাঝে সেই পবিত্র, সুন্দরী অ্যানেটের সামনে আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠত ; নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে বেশ একটু লজ্জা পেতাম। মদনের পঞ্চশরের হাত থেকে আর নিষ্কৃতি পেলাম না, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

আমার মনের মধ্যে একটা ঝড় ব'য়ে যায়। আবার শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিরাশ হ'য়ে পোড়লাম। ভাবলাম, এ জায়গা ছেড়ে না গেলে মনের বেদনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের আর কোনই উপায় হবে না। অনুভব করি, মনের সে আনন্দ হারিয়ে ফেলেছি। একটা

জরুরি ব্যাপারে দেশে ফিরতে হবে, একথা জানিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হোলাম।

আমার কথা শুনে অ্যানেট্ পরিবারের সকলেরই চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে। অ্যানেট্ ছাড়া সকলেই অনুরোধ করে যাতে আমি আবার সামনের বসন্তে তাদের এখানে ফিরে আসি। অ্যানেট্ আমাকে ভাবিয়ে তোলে; ভাবি, আমায় সে ভালবাসে, না আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়।

একদিন সকালে আমি অ্যানেট্ ও ফ্যানীর সঙ্গে ওরনির বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। একটা গোলাপ ঝাড়ের সামনে হঠাৎ থেমে একটু ঠাট্টার ছলে বোললাম, "অ্যানেট্ সুন্দরী, মনে আছে ক্রান্সাক্ পারত্যাগের আগে আমাদের মধ্য ফুলের বিনিময় হয়েছিল? এবারে কিন্তু দিলেও আমি সে ফুল নেব না। ফুলের রাণী, সে তো শেষ হবে গিয়েছে, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুসীর হাসিও তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে, রয়েছে শুধু কাঁটা।"

কথাটা শুনে অ্যানেট্ লজ্জায় রাঙ্গা হযে উঠে, প্রাণ মাতানো হাসির-ঝলক তুলে বোলল, "এবারে আমার বোনের পালা।"

ফ্যানী জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে, ছুটে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল।

"আমি এখুনি ফিরে আসছি, এর মধ্যে আপনাদের ভেতর একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক," এই কথাটি ব'লে একটু সময় না দিয়ে ফ্যানী চলে গেল।

"যাবার বেলা ও হাত থেকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কিছু মিলবে না, ?" আমি অ্যানেট্‌কে বলি।

—"ওঃ, একটা কিছু স্মরণচিহ্ন আপনি চান?"—উত্তরে অ্যানেট্ বলে।

আমি—হায় ভগবান! তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার মত কোন উপহারই কি পাব না? তোমার আমার মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হবে, তাকে সংযোগ করবার জন্য একটা কিছু দাও সুন্দরী, যাতে করে সম্পূর্ণ অভাবটা আমার মনকে চঞ্চল না ক'রে তোলে।

চোখের কোণে একটু মুচকে হেসে অ্যানেট্ বোলল, "যে অ্যানেট্ আপনাকে ফুল দিয়েছিল, স্পেনে থাকবার সময় সে আপনার মনে স্থান পেল না; কিছু না দিয়েই সে স্থান পেল ফ্যানী! ফ্যানার সঙ্গে হাত বদল করুন না! জানেন, আমি কিন্তু ভয়ানক স্বার্থপর!"

আমি—হ্যাঁ, অবুঝ, নিষ্ঠুর। আমার ক্রান্সাকে না আসাই ছিল ভাল। এসে এখান থেকে লাভ করে গেলাম অশান্তি; চিরদিনই বেদনার বোঝা বহন ক'রে চলতে হবে। মরে গেলেও আর আমি ক্রান্সাকে আসছি না।

"ভয় দেখাচ্ছেন কর্ণেল সাহেব, আমাকে দোষ দেন কেন? বেশ তো,"—অ্যানেট্ বলে।

আমি—কথাটা মিথ্যে নয়, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় স্থানটী থেকে আমায় তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

—"হায় ভগবান, আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন? আমি আপনাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি! ভগবান, মুখ তুলে চাও! বাড়ীর সকলেই আপনার যাওয়ার কথায় দুঃখিত, আর আমিও কি কম ব্যথা পেয়েছি! আর আপনি কিনা এই কথা বলছেন?"—ছলছল চোখে অ্যানেট্ ব'লে যায়।

আমি—আমার যাওয়া, না যাওয়া নির্ভর করছে তোমার ওপর,

সুন্দরী। তোমার একটু সামান্য ইঙ্গিতেই, আমার জয় পরাজয়ের বিচার হয়ে যাবে। তুমি কি জান, তোমাকে শুধু ভালবাসার জন্যেই বেঁচে আছি! এ পৃথিবীতে তোমার মত প্রিয় আর আমার কাছে কিছু নেই। আমায় কি থাকতে অনুমতি দিচ্ছ, বল ?

অ্যানেট্ নতমুখে, নীরবে, গাছের সারির মাঝখান দিয়ে চলতে আরম্ভ কোরল।

আমি আর থাকতে না পেরে, তার কোমল হাতখানি ধ'রে ফেলে, আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "আমি কি এখানে থেকে যাব ?"

"কর্ণেল সাহেব, নিজেকে অথবা আমাকে বঞ্চনা ক'রে কোন লাভ নেই। স্পেনে থাকার সময় অ্যানেটের চিন্তা মন থেকে সরে গিয়ে, সেই স্থান অধিকার করেছিল ফ্যানী, আমি কি বুঝি না ?" গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অ্যানেট্ ব'লে যায়।

আমি—কখনই না। অ্যানেটের চিন্তায় আমার মন বিভোর হয়েছিল। ফ্যানির কথাও আমি ভুলিনি, একথা সত্যি। অ্যানেটের দেওয়া ফুলটিকে মূল্যবান পাথরের মত যত্ন করে রেখে দিয়েছি। যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেব, ফুলটিও আমার মৃতদেহের সঙ্গে অনুগমন কোরবে, এই আমার শেষ ইচ্ছা।

অ্যানেট্—কর্ণেল সাহেব, স্পেন থেকে ফিরে এসে ভুল কোরে আমায় ফ্যানী ভেবেছিলেন, না ?"

আমি—সত্যিই তাই ভেবেছিলাম, সুন্দরী। ফ্যানীর থেকে শতগুণ সুন্দর তোমায় মনে হয়েছিল। চার বছর আগে ফ্যানীর পরিবর্ত্তে তোমায় ফুলটি দিয়েই সত্যিকারের আনন্দ পেয়েছিলাম, বিশ্বাস কোরবে ? তুমি কি জান, স্পেনে থাকার সময় তোমাকে আমার হৃদমন্দিরে দেবীর আসনে বসিয়েছিলাম। ভাবতাম, পরীর মত যে পবিত্র তার স্থান স্বর্গে,

এ পৃথিবীতে নয়। মনে হয়, তোমার ওই উচ্চ আসনের পাশে আমার স্থান হোতেই পারে না।

"কে আপনাকে একথা বোললে?"—অশ্রুপূর্ণ চোখে কিশোরী ব'লে যায়।

অভিমানের অশ্রুধারায় তার মুখখানি অপূর্ব্ব সুন্দর হ'যে ওঠে। আনন্দে আমার মন ভরে যায়।

আমি—"অ্যানেট্, বল, বল, তোমার পাশে এখানে আমায় একটু স্থান দেবে?

"ওকথা বলে, আমার মনে কেন ব্যথা দেন?" আমার বুকের ওপর মাথা রেখে কিশোরী ধীরে ধীরে ব'লে যায়।

তার বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে মনে হোল, কোন্ স্বপ্নলোকে যেন চলে গেছি; এমন সময় এক জোড়া হাতের স্পর্শ পেয়েই বুঝলাম, এ ফ্যানী ছাড়া আর কেউ নয়। লতার মত কোমল দুটি হাত দিয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরে তার বোনের ওষ্ঠে দিল প্রথম চুম্বনের স্পর্শ, দ্বিতীয়টী দিল আমায়।

"তোমার প্রিয়তমকে যে চুম্বন দিলাম তার জন্য রাগ কোর না, বোন,"—ফ্যানী বলে যায়।

ফ্যানীর মধুর ব্যবহারে ও গুঞ্জরণের মাঝে প'ড়ে আমাদের তন্দ্রাভাব কেটে যায়।

"ওরনির কাছে আমরা ফিরে গেলাম। সত্যিই আজ আনন্দে জীবন আমার কাণায় কাণায় পূর্ণ।" দার্শনিক উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে ওঠে।

যে বাড়ী বিক্রি হবার কথা ছিল, তার মালিকের কাছে, কারুকে কিছু না জানিয়ে ছুটে চলে গেলাম। আগেই কয়েকবার এই বাড়ীটীর

মধ্যে গিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে সব কিছু দেখেছি। অ্যানেটের মত পেলে অনেক আগেই হয়তো বাড়ীখানা কিনে ফেলতাম। সেদিনই আমি বাড়ী কিনে দলিলে সই করিয়ে নিয়ে তাদের কাছে ফিরে এলাম।

অ্যানেট্ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন কোরল, "সরে পড়ে এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল, শুনতে পারি কি ?"

"জান, গোলাপে ভরা চমৎকার একটা বাগানবাড়ী কিনেছি। আজ থেকে এটা তোমার হোল, সুন্দরী,"—আমি দ্রুতগতিতে বলে গেলাম।

কথাটা শুনে আনন্দে কিশোরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমরা সকলে মিলে দল বেধে আনন্দের ঝড় বইয়ে দিয়ে সরাইখানায় গিয়ে উঠলাম। মিঃ ও মিসেস্ আলব্রেট্‌কে বাড়ী কেনার কথাও জানিয়ে দিলাম।

মিঃ আলব্রেট্ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে অ্যানেটের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোরলেন।

কিশোরী ছন্দিত গতিতে বাপের কাছে ছুটে যায়, আবার আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে গিয়ে মার বুকে ফুলের মত কোমল মুখখানি লুকিয়ে ফেলে।

এই দিন থেকে পৃথিবীটা আমার কাছে স্বর্গের সমান মনে হোল। বোলতে বাধা কি, এখন থেকে অ্যানেট্ আমার চির সঙ্গিনী। সরাইখানা আমার ও ওরনির মনের মধ্যে আনন্দের উৎস জাগিয়ে দিয়েছে। মনের ব্যাধি নিয়ে যে কোন লোকই আমাদের এখানে আসুক, আমি জোর গলায় বলতে পারি, এই মধুর পরিবেশে তাকে সুস্থ হ'তেই হবে।

বীণা

নববিবাহিত দম্পতি মধু-চন্দ্র নিশির আনন্দে বিভোর। তাদের দেখে মনে হয়, প্রেমের রাজত্বকে শুধু এরাই অধিকার কোরে বসে আছে। আনন্দ সাগরে তাবা ডুব দিয়েছে। ভবিষ্যতের ভাবনা একটুও তাদের মনে স্থান পায় না।

আশৈশব কিশোরী ছিল তরুণের বান্ধবী, খেলার সাথী। অবস্থার বিপাকে পড়ে এই শান্তির নীড় গ'ড়ে নিতে সেল্‌নায়কে অনেকটা সময় অপেক্ষা কোরতে হয়েছিল। প্রকৃত প্রেমিক তার প্রিয়তমাকে লাভ করার জন্যে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা কোরতে পারে।

অবশেষে প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করে রবিবার দিন তরুণ তার প্রিয়তমাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বাসভবনে প্রবেশ কোরলেন।

আত্মীয়দের মাঝে উৎসব ও শুভেচ্ছার মধ্যে দিয়ে একে একে দিনগুলি কেটে গেল। এরপর নীরবতার মাঝে এসে তারা যেন স্বর্গ-সুখ লাভ কোরল।

কত মধুর দিন রাত্রি তাদের প্রেমের গুঞ্জরণের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। কখনও সেল্‌নায় বাঁশী নিয়ে বসে, বাঁশীর রন্ধ্র থেকে বেরিয়ে আসে সুমধুর রাগিনী। আবার তরুণীর হস্তের স্পর্শে বীণার তন্ত্রীগুলি ঝঙ্কারিত হয়ে ওঠে। তাদের এই মধুর মিলন দেখে মনে হয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের সাদর অভ্যথনার জন্য আসন বিছিয়ে রেখেছে।

একদিন সন্ধ্যায় পরস্পরের সঙ্গীত চর্চ্চা শেষ হয়ে গেলে, জোসেফাইন তাঁর প্রিয়তমকে জানালেন, মাথায় তিনি একটা বেদনা অনুভব কোরছেন।

পাছে স্বামী চিন্তিত হোয়ে পড়েন এই ভেবে রমণী দিনের মধ্যে একবারও এ বেদনার কথা তাঁকে জানাননি। স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য সন্ধ্যার সঙ্গীতের উত্তেজনায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামীর কাছ থেকে ব্যথাকে তিনি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। যুবক চিন্তিত হোয়ে ডাক্তারকে সংবাদ দিলেন। ডাক্তার অভয় দিয়ে বোললেন —চিন্তার কোন কারণ নেই, সকালের মধ্যে সব কষ্ট চলে যাবে।

সারা রাত্রি রুগ্না অজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকে গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা কোরে জানালেন, যে একটা বিশেষ রকমের স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় আক্রান্ত হোয়ে, রমণীর এই অবস্থা হয়েছে! চিকিৎসা ও সেবার দিক থেকে কোন ত্রুটি হোল না, কিন্তু রুগ্নার অবস্থা দিন দিন সঙ্গীন হোয়ে এল।

মিঃ সেল্‌নার্‌ বিশেষ রকম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নবম দিনে যোশেফাইন হৃদয়ঙ্গম কোরলেন, পৃথিবীতে তাঁর আর বেশীদিন থাকা হবে না, ডাক্তার বৃথাই তাকে এ ধরণের আশ্বাস দিচ্ছেন। রমণীর বুঝতে বিলম্ব হোল না, দিনগুলি তাঁর শেষ হয়ে আসছে; একথা ভেবে জোসেফাইন মনকে শক্ত করে বেঁধে নিলেন।

শেষবারের মত প্রিয়তমের হাতখানিকে ধরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে রমণী বোললেন,—এমন সুন্দর পৃথিবী, যেখানে আমরা সুখের নীড় বেঁধেছিলাম সেখান থেকে বিদায় নিতে সত্যিই আমার মন বেদনায় ভরে আসছে। তোমার বাহুবন্ধনের মধুরতা থেকে বঞ্চিত হলেও, জানি আমার অশরীরি আত্মা তোমার চারি পাশে ঘুরে বেড়াবে। আবার পরজন্মে তোমায় আমায় মিলন হবে।

এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। জোসেফাইন চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পোড়লেন। রাত্রি তখন নটা।

শোকে সেল্‌নারের হৃদয় বিদীর্ণ হোয়ে গেল। তাঁর শরীর ভেঙ্গে পোড়ল। কয়েক সপ্তাহ ধ'রে নীরবে এই বেদনাকে সহ্য করার পর, ধীরে ধীরে তাঁর মন সুস্থ হোতে লাগলো। যৌবনের সৌকুমার্য্য, অনুপ্রেরণা হারিয়ে, বিষাদপূর্ণ চিন্তার মধ্যে তাঁর মন তলিয়ে গেল। মাঝে মাঝে অতীতের বেদনা দায়ক স্মৃতির টুকরোগুলি এসে তাঁর চিত্ত-সরোবরে আলোড়ন এনে দেয়। জোসেফাইন গত হবার পর, তাঁর জিনিষপত্রগুলি একইভাবে পড়ে থাকে, সেগুলিকে কেউই স্পর্শ করে না। বোনার জিনিষগুলি আগের মতই টেবিলের ওপর পড়েছিল। বীণাটিও ঘরের কোণে নির্দ্দিষ্ট স্থানেই দেখতে পাওয়া গেল। সন্ধ্যায় যুবক প্রিয়তমার স্মৃতিবিজড়িত ঘরখানির মধ্যে গিয়ে, জানলার ধারে দাড়িয়ে বাঁশীটি মুখে লাগিয়ে স্বপ্ন জগতের মধ্যে তলিয়ে যেতেন।

এক চাঁদিনী রাতে সামনের দুর্গের চূড়া থেকে প্রহরী নটা বাজার সময় সঙ্কেত করার সঙ্গে সঙ্গেই জোসেফাইনের বীণা থেকে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বেরিয়ে এল। যুবক এই অলৌকিক ঘটনায় চমকে গিয়ে তাঁর বাঁশী বাজান থামিয়ে ফেললেন। বীণার ঝঙ্কারও থেমে গেল। কিছু পরে আবার যেই তিনি জোসেফাইনের প্রিয় রাগিনীটি নিয়ে বাঁশীতে আলাপ কোরছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর সুরে সুর মিলে গিয়ে বীণাটি বেজে উঠলো। আনন্দে তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঝেতে পড়ে অনুভব কোরলেন যেন তাঁর প্রিয়তমার অশরিরী কায়াকে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন। এর কিছু পরেই, উত্তপ্ত বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে একটা আবছা আলোয় ঘর ভরে গেল। উচ্ছ্বসিত হয়ে যুবক বলে উঠলেন,—তুমিই তো আমার জোসেফাইনের অশরীরি ছায়া। আমার কাছে এসে মাঝে মাঝে স্নেহের স্পর্শ দিয়ে যাবে, সত্যিই তুমি আমায় এখনও ভালবাস, না ?

তোমার নিঃশ্বাস ও চুম্বনের স্পর্শ আমার ওষ্ঠে অনুভব কোরছি। তোমার উপস্থিতিতে আমার সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে।

আরেকবার যুবক যেই বাঁশী তুলে ধরেছেন, অমনি বীণাটী বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছনাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। সন্ধ্যার উত্তেজনায় যুবকের স্নায়ুতন্ত্রীগুলি ভীষণভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে।

রাত্রে তাঁর সুনিদ্রা হয় না। ঘুমের মাঝে মূর্চ্ছনাটা যেন তাঁকে ডাকছে, "চলে এস, আমি তোমায় ডাকছি"।

একটু দেরীতেই তাঁর ঘুম ভাঙ্গে। রাত্রের সেই স্বপ্নের আমেজটা তাঁর মন থেকে এখনো সরে যায়নি। তাঁর স্ত্রীর আত্মা তাদের প্রেমকে দেহাতীত কোরে তুলেছে, এই ভেবে তাঁর অন্তর্জ্জগতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

জোসেফাইনের ঘরে গিয়ে বাঁশী বাজিয়ে সুরের মধ্যে দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কোরবেন, তিনি এই ভেবে সন্ধ্যার অপেক্ষায় অধীর চিত্তে বসে থাকেন। নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যেই না যুবক বাঁশীতে সুর ধরেছেন অমনি বীণার ঝঙ্কারে সারা ঘরটা গম্ গম্ করে ওঠে। বাঁশীর শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গেই বীণার মূর্চ্ছনাও বন্ধ হয়ে যায়। আবছা আলোটা যেই না তাঁর মাথার ওপরে দাঁড়ায় অমনি তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠেন —জোসেফাইন! জোসেফাইন! তোমার বুকে আমায় তুলে নাও। বীণার মূর্চ্ছণার রেশটা ধীরে ধীরে মিলিযে যায়। প্রথম বারের থেকে এবারের উপলব্ধি তাঁর মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। সেল্‌নার তাঁর নির্জ্জন ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করেন।

তাঁর বিশ্বস্ত চাকর প্রভুর অবস্থা দেখে এতই ব্যথিত হয়ে পড়ে যে, কারুকে কিছু না জানিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে। ডাক্তার ছিলেন সেল্‌নারেরই বন্ধু। তিনি পরীক্ষা কোরে দেখলেন জোসেফাইনের

অসুখের লক্ষনের সঙ্গে কোনই পার্থক্য নেই, এমন কি মৃতার থেকেও তাঁর অবস্থা শোচনীয়। রাত্রে সেল্‌নারের জ্বরের মাত্রা খুবই বেড়ে গেল। জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে তিনি জোসেফাইন আর তার বীণার কথা বোলে যাচ্ছিলেন।

সকালে তাঁর অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হোল। মানসিক চঞ্চলতা কমে গেল। যাতনার অবসান হোল বটে কিন্তু তাঁর মনে হোল জীবনের শেষ অধ্যায়ে আসতে আর বেশী দেরী নেই! ডাক্তার সেল্‌নারকে অভয় দিলেন। রুগী গত সন্ধ্যার বিবরণগুলি তাঁর কাছে একে একে দিয়ে গেলেন, ডাক্তারের কথায় তিনি আশ্বস্ত না হয়ে নিজের মতকেই ধরে রইলেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ দুর্ব্বল হয়ে পোড়ল। কম্পিত স্বরে সেল্‌নার সকলকে অনুরোধ কোরে বোললেন—আমাকে জোসেফাইনের ঘরে আপনারা পৌছে দিন। কথা মত তাঁকে স্থানান্তরিত করা হোল।

সেল্‌নার স্থির চিত্তে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। অঝরে তাঁর চোখের জল ঝরে পোড়ছিল। সেলনার স্পষ্ট অনুভব কোরলেন, ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জীবনের দীপশিখা নিতে যাবে। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ডাক্তার ছাড়া অন্য সকলকে ঘরের বাইরে যেতে অনুরোধ কোরলেন। আরেকবার দুর্গের চুড়া থেকে নটার ঘণ্টা বেজে উঠলো। সেল্‌নারের চোখদুটি স্থির হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর্গীয় উজ্জ্বলতায় তাঁর মুখখানি ভরে গেল। মৃদুস্বরে একবার তিনি বলে উঠলেন ;—এখান থেকে বিদায় নেবার আগে, জোসেফাইন আমার পাশে এসে দাঁড়াও। তোমার প্রেমের স্পর্শে যাতে মন থেকে ভয় দূরে সরে যায় সেই আশ্বাস দাও। সঙ্গে সঙ্গেই বীনার তন্ত্রীগুলি থেকে সুমধুর সুর (রাগিনী) বেরিয়ে এলো

আর মৃত্যুপথের যাত্রীর দেহের ওপরে একটা উজ্জল আলো এসে ঘুরতে লাগলো। আমি আসছি! আমি আসছি! এই কথা দুটি বোলে তিনি যেন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজয় স্বীকার কোরে নিলেন। বীনার ঝঙ্কার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। সেল্‌নারের দেহ অসাড় হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন অদৃশ্য হাত এসে বীনার তারগুলিকে ছিঁড়ে দিল।

ডাক্তার দুঃখে বিচলিত হয়ে যুবকের চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন। মনে হচ্ছিল মিঃ সেল্‌নার্‌ যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। শোকে অধীর হয়ে ডাক্তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। বন্ধুর মৃত্যু সচক্ষে দেখে ডাক্তার শোকে এতই অভিভূত হয়ে পোড়েছিলেন যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে এই দুঃসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে বহন করে নিয়ে যেতে পারেননি। ভগ্নবীনাটিকে বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ যত্ন করে রেখে দিয়েছেন।